সূচী পত্র

- ❖ প্রারম্ভ কথা - এম এ হান্নান ২
- ❖ পবিত্র কোরআনে ধনসম্পদ সম্বন্ধে মহান আল্লাহ'র বাণী - সৈয়দ আহমাদ ৪
- ❖ রোজার তাৎপর্য - মাওলানা মাহমূদুল হাসান ১০
- ❖ Zikrullah – Mufleh R. Osmany ১৪
- ❖ মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রসঙ্গ, মধ্যপন্থা, জেহাদ ও রেনেসাঁ - এ কে এম নুরুল ফজল বুলবুল ১৮
- ❖ আধুনিক জীবন ও ইসলাম - মোহাম্মাদ জাফর ২১
- ❖ Ghazzali and Purification of Heart – Syed Rezaul Karim ২৬
- ❖ স্রষ্টাপ্রেম ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা - ড. মুহাম্মদ আব্দুল মুনিম খান ২৮
- ❖ ভোগ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ইসলামী অনুশাসন - ড. আব্দুল্লাহ্ আল-মারূফ ৩৫
- ❖ বাংলাদেশে ইসলামের সেবায় আমাদের কর্তব্য - কবি রুহুল আমীন খান ৩৯
- ❖ Riba And Its Types – Dr. Mohammed Haider Ali Miah ৪৪
- ❖ গুলশান কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে বিভিন্ন জু'মায় প্রদত্ত খুতবার উদ্ধৃতাংশ ঃ খতীব মাওলানা মাহমূদুল হাসান ৪৮
- ❖ গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটির কার্যক্রম - এম এ হান্নান ৫২
- ❖ রোজার জরুরি মাসআলা ৫৭
- ❖ Members of the Executive Committee of the Gulshan Central Masjid And Iddgah Society ৫৮
- ❖ Members of the Governing Body of the Islamic Research Society ৫৯

প্রারম্ভ কথা ঃ

আলহামদুলিল্লাহ্ ! আমাদের পূর্বসূরী মুরব্বীদের গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মুহাম্মাদূর রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুসৃত ও প্রদর্শিত পথে-সিরাতুল মুস্তাকিমের হেদায়েত নসীবের লক্ষ্যে, ঈমান-ইল্‌ম-আমলের সঠিক পথের সন্ধান ও অন্বেষার উদ্দেশ্যে 'ইসলামিক রিসার্চ সোসাইটি বাংলাদেশ' (প্রস্তাবিত)-এর উদ্যোগে একটি রিসার্চ প্রকাশনা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এর নিকট শোকর আদায় করছি এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে সুপ্রিয় পাঠকদের অবগতির জন্য আমাদের গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটির গঠনতন্ত্র (Memorandum of Association) এর কিছু ধারা উল্লেখ করতে চাই ঃ

1. This is a Socio-religious organization for performance of religious rites, learning and research.
2. The aims and objects of the Masjid Society shall be as under :
   b) To develop the Masjid into an ideal seat of Islamic Culture, learning and Research & to print & publish books, periodicals, journals, literature, research paper etc. in furtherance of the aims & objects of the Society.

উক্ত ধারার প্রেক্ষিতে আমরা মসজিদ নির্মাণ করেছি এবং এর উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে তার নক্‌শা বিগত ০৭/০৯/১৯৭৭ইং তারিখে তৎকালীন ডি.আই.টি থেকে অনুমোদন করা হয়েছে, সয়েল টেস্ট করা হয়েছে এবং তখন থেকেই এটি প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চলছে। বিগত জানুয়ারী ১৯৮২ সালে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার চালু করে সেখানে ২টি কোর্সও চালু করে কিছুদিন পরিচালিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অর্থের অভাবে তা বন্ধ করে দিতে হয়। তাছাড়া ১৯৮৩ সালে একটি মাসিক পত্রিকা 'আল-ইসলাম' নামে প্রকাশ করা হয়, যার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন আমাদের সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি মরহুম কাজী এ গোফরান, সেটিও ওই একই কারণে বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর থেকে ইসলামী রিসার্চ সেন্টারের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য অসংখ্যবার কার্যকরী কমিটির সভায় ও বার্ষিক সাধারণ সভায় এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে, বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগও করা হয়েছে যথাঃ- সৌদি এ্যাম্বেসি, কুয়েত জয়েন্ট রিলিফ কমিটি, ধাবি গ্রুপ ইত্যাদি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি।

পরবর্তীতে ০৮/০৮/২০০৭ইং তারিখে আমরা একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির কাছে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের একটি ইমারত নির্মাণের জন্য প্রস্তাব পাঠাই। তারা আমাদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের নকশা অনুমোদন করে এর কিছু অংশ প্রতিমাসে ৯০ লক্ষ টাকা ভাড়া ঠিক করে অগ্রিম ২০ কোটি টাকা দিয়ে ইমারত নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের পূর্বেই উক্ত কোম্পানি ইহুদি নাসারাদের মালিকানাধীন হওয়ায় আমাদের সদস্যগণের আপত্তি থাকার কারণে সেই উদ্যোগ বাতিল করা হয়। অতঃপর বাংলাদেশ কিংবা মুসলিম দেশের কোন প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির তরফ থেকে অনুরূপ কোন প্রস্তাব পাওয়া যায় কিনা তারও প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু তার কোন সুফল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বিগত ২০০৮ইং সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের জোর দাবির প্রেক্ষিতে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। আমাদের কার্যকরী কমিটির সুযোগ্য দু'জন সদস্য সাবেক রাষ্ট্রদূত, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ও বিচ-এর সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মুফলেহ আর ওসমানী এবং এক্সিম ব্যাংক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য পরিচালক জনাব এ কে এম নুরুল ফজল বুলবুলের নেতৃত্বে

[হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমনভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর; যেন তোমরা পরহেজগার হতে পার। (সুরা বাকারা-১৮৪)]

৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গত ২৮ আগস্ট, ২০০৯ইং ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করা হয় এবং বর্তমানে ১২ সদস্যবিশিষ্ট গভর্নিং বডি এর বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আমাদের ইসলামিক রিসার্চ সোসাইটির কাজ শুরু করার জন্য একজন পরিচালক (গবেষণা) ও একজন গবেষণা সহযোগী নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং এর জন্য একটি ওয়েব সাইটও (www.irsb.net) খোলা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় তারা একটি 'রিসার্চ প্রকাশনা' প্রকাশ করতে যাচ্ছে। তাদের এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সার্বিক অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করছি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠার চিন্তা যে সব মুরিব্বী করেছেন তারা হলেন : সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব মরহুম দেওয়ান আব্দুল বাছেত, বিচারপতি আব্দুল জব্বার খান, মরহুম মশিহুর রহমান, মরহুম মোঃ শাহজাহান, সোসাইটির প্রথম মহাসচিব মরহুম ক্যাপ্টেন নুরুদ্দাহার, প্রথম খতিব মরহুম মাওলানা আব্দুস সালাম প্রমুখ। তাঁরা সকলেই সূচনালগ্ন থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন করে ইন্তেকাল করেছেন। তাদের আরধ্য কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমাদের সকলের। তাই আমি গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ্ সোসাইটির তরফ থেকে সকলকে অনুরোধ জানাবো-আবেদন জানাবো, আসুন আমরা সকলে মিলে এই প্রতিষ্ঠানটি বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট হই এবং এগিয়ে আসি।

বর্তমান বিশ্বে যে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে তাতে আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি ঘটেছে সত্য তবে মানুষের বিবেক, বিবেচনা, নৈতিকতাবোধ এবং আত্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। মানুষে মানুষে রেষারেষি, হানাহানি, খুন-খারাবি, মাদকদ্রব্য সেবনের প্রবণতা বৃদ্ধি, তরুণ সমাজের অপসংস্কৃতি চর্চা, পরিবারের বন্ধন ও আন্তরিকতা হ্রাস পেলেও মসজিদের সংখ্যা এবং নামাজির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ভাল মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। মানুষের বিবেক বিবেচনা যেন দিন দিন লোপ পাচ্ছে। বিশেষ করে ইসলামী মূল্যবোধের প্রগাঢ় অবক্ষয় হয়েছে। এমন সামাজিক দুরবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সংবাদপত্র এবং পত্র-পত্রিকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের চারিত্রিক উন্নতির লক্ষ্যে আমাদের এই প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ একটি ভাল প্রকাশনা ও যুগপোযোগী লেখা একটি জাতিকে তথা সমাজকে দুর্বল অবস্থা থেকে উত্তরণে এবং সমাজে বসবাসরত মানুষকে সৎ ও ভাল পরামর্শ দিয়ে নৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। সর্বোপরি একটি সৎ ও সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে এবং ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের কাঙ্ক্ষিত যুগোপযোগী ও সৃজনশীল লেখা সম্বলিত প্রকাশনা যেন সমাজের চাহিদা পূরণ করতে পারে, মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে আদর্শ সমাজ গঠনের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় কাজে আসে তার জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করি। পরিশেষে গবেষণা প্রসঙ্গে আলাহ্'র কালামে পাকের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করতে চাই ঃ

"উহারা কি কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না ? না উহাদিগের অন্তর তালাবদ্ধ ? (সূরা মোহাম্মদ আয়াত-২৪)

এম এ হান্নান
সেক্রেটারী জেনারেল
গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটি

["হে মুমিনগণ তোমরা অধিকাংশ অনুমান হইতে দূরে থাক কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করিও না। (সূরা হুজুরাত - ১২)]

পবিত্র কুরআনে ধনসম্পদ সম্বন্ধে মহান আল্লাহ্'র বাণী ঃ

সূরা আল বাক্বারা ২

(আয়াত ২৪৫) এমন কে আছে - যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে ? অনন্তর তিনি তাকে দ্বিগুণ বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ্ই (মানুষের আর্থিক অবস্থাকে) কৃচ্ছ্র বা স্বচ্ছল করে থাকেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে ।

(আয়াত ২৫৪) হে মুমীনগণ ! আমি তোমাদিগকে যে উপজীবিকা (রিজিক দান) করেছি তা হতে সে দিন সমাগত হওয়ার পূর্বেই ব্যয় কর যে দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না, আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী ।

(আয়াত ২৬৭) হে মুমিনগণ ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু খরচ কর ।

(আয়াত ২৭২) ... ... তোমরা ধনসম্পদ হতে যা ব্যয় কর বস্তুত তা তোমাদের নিজেদের জন্য; আর একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের চেষ্টা ব্যতীত (অন্য কোন উদ্দেশ্যে) অর্থ ব্যয় করো না এবং তোমাদের হালাল সম্পদ হতে যা ব্যয় কর তা সম্পূর্ণভাবে পুনঃ প্রাপ্ত হবে, আর তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না ।

(আয়াত ২৭৩) দান খয়রাত ওই সব লোকের জন্য যারা আল্লাহ্'র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে, জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয় । তাদের সাবলীল চলাফেরার জন্য অজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবহীন মনে করে । তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে । তারা মানুষের কাছে প্রার্থনা করে না এবং তোমরা বৈধ সম্পদ থেকে যা ব্যয় কর সে বিষয়ে (আল্লাহ্) সম্যকরূপে অবগত ।

(আয়াত ২৭৪) আর যারা রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে তাদের রবের নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না ।

(আয়াত ২৭৬) সুদকে আল্লাহ ক্ষয় করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন । বস্তুত আল্লাহ অতি কৃতঘ্ন পাপাচারীদের ভালবাসেন না ।

সূরা আলে ইমরান ৩

(আয়াত ১৩৪) যারা সচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানবদেরকে ক্ষমা করে; বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন ।

(আয়াত ১৮৬) অবশ্যই তোমরা তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবন সম্পর্কে পরীক্ষিত হবে ।

সূরা আন্ নিসা ৪

(আয়াত ৩৮) এবং যারা লোকদের দেখাবার জন্য স্বীয় ধনসম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্'র প্রতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা, আর যার সহচর শয়তান সে নিকৃষ্ট সঙ্গীই বটে ।

(আয়াত ১১৪) যে ব্যক্তি দান খয়রাত করে ... ... এবং আল্লাহ্'র প্রসন্নতা সন্ধানের জন্য ওই রূপ করে আমি তাকে মহান বিনিময় প্রদান করব ।

["দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য, সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য, লোকে যাহা বলে ইহারা তাহা হইতে পবিত্র। ইহাদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। (সূরা নূর- ২৬)]

সূরা আল মায়িদা ৫

(আয়াত ১২) এবং আল্লাহ্ বলেন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা নামাজ কায়েম কর এবং যাকাত আদায় করতে থাক, আমার রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ এবং আল্লাহ্কে উত্তমরূপে কর্জ দিতে থাক, তা হলে আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহ্গুলি তোমাদের থেকে মোচন করে দিব।

সূরা আল আন্আম ৬

(আয়াত ১৬৫) আর তিনি এমন যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, উদ্দেশ্য হল তোমাদের তিনি যা কিছু দিয়েছেন তাতে তোমাদের পরীক্ষা করা।

সূরা আল আনফাল ৮

(আয়াত ২৮) আর তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র এবং নিশ্চয় আল্লাহ্'র নিকট মহা পুরস্কার রয়েছে।

(আয়াত ৬০) আর তোমরা আল্লাহ্'র পথে যা কিছু ব্যয় কর তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি (কম দিয়ে) অত্যাচার করা হবে না।

(আয়াত ৭৫) এবং যারা আত্মীয় তারা আল্লাহ্'র বিধান মতে একে অন্য অপেক্ষা হকদার।

সূরা তওবা ৯

(আয়াত ৩৪) আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহ'র পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

(আয়াত ৬০) ছদক্বাহ তো হচ্ছে শুধুমাত্র গরিবদের এবং অভাবগ্রস্তদের জন্য আর এই ছদক্বাহ (আদায়ের) জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং যাদের মন রক্ষা করতে অভিপ্রায় হয় (তাদের) আর গোলামদের আজাদ করার কাজে এবং কর্জদারদের কর্জে (কর্জ পরিশোধে) আর আল্লাহ্'র রাস্তায় জিহাদে অর্থাৎ যুদ্ধ সরঞ্জাম ও রসদপত্র সংগ্রহের জন্য, আর মুসাফিরদের সাহায্যার্থে।

সূরা রাদ ১৩

(আয়াত ২২) আর তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, ছালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ (সহায় সম্পদ) দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, তাদের জন্য পরকালের ঘর (শুভ পরিণাম)।

সূরা ইব্রাহিম ১৪

(আয়াত ৩১) আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মু'মিন তাদেরকে বল ছালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে - সে দিন আসার পূর্বে যে দিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না।

[হে রাসূল (সাঃ)! আপনি মুমিন নারীদিগকে বলে দিন, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, তাহারা যেন যাহা সাধারণত প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতীত তাহাদের আবরণ প্রদর্শন না করে, তাহাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। (সূরা নূর- ৩১)]

সূরা বনী ইসরাঈল ১৭

(আয়াত ২৯) তুমি তোমার হাতটা তোমার গর্দানের কাছে আটকে রেখো না (অর্থাৎ বদ্ধমুষ্টি হয়ো না) এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না; তা হলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।

সূরা রূম ৩০

(আয়াত ৩৮) অতএব, আত্মীয়কে দিয়ে দাও তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।

(আয়াত ৩৯) মানুষের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে এ আশায় সুদে যা কিছু তোমরা দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা বৃদ্ধি পায় না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমরা যা যাকাত দান করে থাক তার পরিবর্তে তোমরা দ্বিগুণ প্রাপ্ত হবে।

সূরা সাবা ৩৪

(আয়াত ৩৭) তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে; তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই তাদের কর্মের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার; আর তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদ থাকবে।

(আয়াত ৩৯) আপনি বলুন ঃ নিশ্চয় আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার রিজিক বর্ধিত করেন, অথবা ওটা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিয্‌ক্ দাতা।

সূরা ফাতির ৩৫

(আয়াত ২৯) নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব কুরআন পাঠ করে, ছালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিয্‌ক্ দিয়েছি তা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসায়ের, যার ক্ষয় নাই।

সূরা যারিয়াত ৫১

(আয়াত ১৯) এবং তাদের ধন সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক।

সূরা নাজ্‌ম্ ৫৩

(আয়াত ৩৮) কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না (অর্থাৎ নিজের গোনাহের বোঝা নিজেকেই বহন করতে হবে)।

(আয়াত ৪৮) আর তিনিই আল্লাহ্ যিনি অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন।

সূরা আর রহমান ৫৫

(আয়াত ৯) তোমরা ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।

(আয়াত ৬০) উত্তম কাজের জন্য একমাত্র উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে ?

[আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (স.) কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না। কেহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করিলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হইবে। (সূরা আহযাব - ৩৬)]

সূরা হাদীদ ৫৭

(আয়াত ৭) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে তাদের জন্য আছে মহা পুরস্কার।

(আয়াত ১০) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে না ? অথচ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই।

(আয়াত ১১) এমন কে আছে যে আল্লাহকে দিবে উত্তম ঋণ ? তাহলে তিনি বহু গুণে একে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

(আয়াত ১৮) নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ বেশি এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

(আয়াত ২০) বস্তুত পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

(আয়াত ২৪) যারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়; আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

সূরা হাশর ৫৯

(আয়াত ১৮) হে মু'মিনগণ ! আল্লাহকে ভয় কর, এবং প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। আবারও বলছি যে, আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।

সূরা মুনাফিকূন ৬৩

(আয়াত ৯) হে মু'মিনগণ ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। যারা এমনটা করবে (অর্থাৎ উদাসীন হবে) তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

(আয়াত ১০) আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক্ দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় কর তোমাদের কারও মৃত্যু আসার পূর্বেই (অন্যথায়) সে বলবে ঃ হে আমার রব ! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি ছদকাহ করতাম এবং সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। আল্লাহ কাউকে অবকাশ দিবেন না। যখন মৃত্যুর সময় হয়ে যাবে।

সূরা তাগাবুন ৬৪

(আয়াত ১৫) তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ মাত্র; আল্লাহর নিকটই রয়েছে মহা-পুরস্কার।

(আয়াত ১৬) তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর, তাঁর আদেশ শোনো এবং তাঁর আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণে; যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত তারাই সফলকাম।

(আয়াত ১৭) যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ওটা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী ও সহনশীল।

সূরা হাক্কাহ্ ৬৯

(আয়াত ২৮) (যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে) আমার ধনসম্পদ আমার কোন কাজেই এলো না।

(আয়াত ২৯) আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।

[যারা মুমিন নর-নারীকে বিপদাপন্ন করিয়াছে অতঃপর তওবা করেন নি তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি আর আছে দহন যন্ত্রণা। (সূরা বুরুজ- ১০]

সূরা মুয্যামমিল ৭৩

(আয়াত ২০) আর তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর।

সূরা মুদ্দাছছির ৭৪

(আয়াত ৬) (লোকদের হইতে) অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করো না।

সূরা ক্বিয়ামাহ ৭৫

(আয়াত ১৩) সেদিন (ক্বিয়ামতের দিন) মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে।

সূরা আদ-দাহার ৭

(আয়াত ৮) তারা আল্লাহর মহব্বতে (সন্তুষ্টির জন্য) অভাবগ্রস্ত ইয়াতিম ও বন্দিকে আহার্য দান করে।

(আয়াত ৯) এবং তারা বলে ঃ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হইতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।

সূরা ইনফিতার ৮২

(আয়াত ৪) এবং যখন কবর উন্মোচিত হবে।

(আয়াত ৫) তখন প্রত্যেককে যা পূর্বে প্রেরণ করেছে এবং পশ্চাতে পরিত্যাগ করেছে তা পরিজ্ঞাত হবে।

সূরা ফজর ৮৯

(আয়াত ২০) এবং তোমরা ধনসম্পদের অত্যধিক মায়া করে থাক।

সূরা লাইল ৯২

(আয়াত ১১) এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে।

(আয়াত ১৮) যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্ম শুদ্ধির উদ্দেশ্যে (১৯) এবং তার প্রতি কোন অনুগ্রহের প্রতিদান হিসাবে নয়। (২০) বরং শুধু তার মহান রবের সন্তোষ লাভের প্রত্যাশায়। (২১) সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।

সূরা দুহা ৯৩

(আয়াত ৯) অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না। (১০) আর সওয়ালকারীকে ভৎসনা করো না। (১১) তুমি তোমার রবের অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করতে থাকো।

সূরা আদিয়াত ১০০

(আয়াত ৬) মানুষ অবশ্যই তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ (৭) এবং নিশ্চয়ই সে নিজেই এ বিষয়ের সাক্ষী এবং (৮) অবশ্যই সে ধন সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত কঠিন।

সূরা তাকাসুর ১০২

(আয়াত ১) প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে (২) যতক্ষণ না তোমরা কবরসমূহে উপস্থিত হচ্ছ। (৩) এটা সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে। (৮) এর পর অবশ্যই সে দিন তোমরা সুখ সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।

সূরা হুমাযা ১০৪

(আয়াত ১) দুর্ভাগ্য প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। (২) যে অর্থ জমা করে ও তা গুনে গুনে রাখে (৩) সে ধারণা করে যে তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে (৪) কখনো না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।

সূরা মাউন ১০৭

(আয়াত ১) তুমি কি দেখেছ তাকে, যে কর্মফল দিবসকে (ক্বিয়ামতের দিন) মিথ্যা বলে থাকে ? (২) সে তো সেই, যে (ইয়াতিম) পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। (৩) এবং সে অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান করে না।

বাংলা ভাষ্য ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান কর্তৃক অনুবাদিত 'কুরআন মাজীদ বাংলা অনুবাদ' হইতে গৃহীত

সংকলনে ঃ সৈয়দ আহমাদ
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সভাপতি, গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটি

রোযার তাৎপর্য ঃ

রোজার বৈশিষ্ট্য ঃ

রমযান মাসের রোযার অগণিত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, যার বিস্তৃত বর্ণনা এই অল্প পরিসরে সম্ভবপর নহে। তবে নিম্নে এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেওয়া হইল ঃ

১। রোযার প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল আল্লাহ্'র উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন। রোযাদার ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্'র প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস জন্মায় এবং আল্লাহ্'র প্রেমে তাহার অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহপাক সর্বশক্তিমান, সর্বপরিজ্ঞাত এবং সর্বস্থানে বিরাজিত। তিনি বিচারের দিনের মালিক। এই বিশ্বাস নিয়া রোযাদার একমাত্র আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের সকল ক্ষুধা, পিপাসা, কাম, ক্রোধ, লোভ ও লালসা ইত্যাদি দমনপূর্বক রোযা রাখে।

২। চরিত্র সংশোধন রোযার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। রোযা মানুষের ভিতর ও বাহির উভয় দিকের সংশোধনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। মানুষের বাতেন বা ভিতরের অবস্থাকে পরিবর্তন করিয়া নূরান্বিত করা এবং তাহার স্বভাবকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলা রোযার মাধ্যমেই সম্ভব। এই প্রেক্ষিতে রোযা মানুষকে দুনিয়ার লোভ-লালসা, অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। আর ইহা ক্বলবের বিশুদ্ধতার দ্বারাই হইতে পারে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

মনোযোগের সহিত শোন ! শরীরের মধ্যে একটি গোশ্তপিণ্ড রহিয়াছে, যতক্ষণ উহা ভাল থাকিবে, সমস্ত দেহ ভাল থাকিবে, আর যখন উহা বিগড়াইয়া যাইবে, তখন সমস্ত দেহ বিগড়াইয়া যাইবে। শুনিয়া রাখ ! উহা হইতেছে ক্বলব। ক্বলবকে সুস্থ রাখার পূর্ণ ব্যবস্থা রোযার মধ্যে রহিয়াছে। আর ক্বলবের অবস্থাকে পবিত্র ও নির্মল করিবার জন্য নামাযের পরই রোযার স্থান।

৩। সবর অর্থাৎ ধৈর্যধারণ করা ইসলামের একটি বিশেষ আদর্শ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এই সম্পর্কে অগণিত প্রমাণ রহিয়াছে। এক হাদীসে সবরকে ঈমানের অর্ধাংশ বলা হইয়াছে। মুসলিম শরীফের হাদীসে সবরকে রূহানী আলো বলা হইয়াছে, আর রমযান মাসকে ধৈর্যের মাস বলা হইয়াছে। রোযা রাখার কারণে মানুষ নিজের নফসের যথেচ্ছাচারী অবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে শেখে। রমযানের এই শিক্ষাকে ধৈর্যের শিক্ষা বলা হয়। কুরআনে পাকের ঘোষণা ঃ যাহারা ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্পাক তাহাদিগকে পরিপূর্ণ পুণ্য প্রদান করেন।

৪। রমযানের আর একটি বৈশিষ্ট্য শোকর অর্থাৎ মানুষ আল্লাহপাকের অসংখ্য নেয়ামতের শোকর গোজারি বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে। আল্লাহ পাক কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য নিয়ামত বর্ধিত করিয়া দিব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি ভয়ঙ্কর। রোযা দ্বারা মানুষ কৃতজ্ঞ হইতে শিখে এবং আল্লাহ্পাকের হুকুমের ক্বদর ও ক্বীমত বুঝিতে পারে। এই প্রসঙ্গে কুরআনে বর্ণনা রহিয়াছে ঃ আল্লাহপাকের প্রদত্ত হেদায়েতের দরুন তোমরা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এবং তাঁহার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

আল্লাহপাকের মহব্বতে ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে তোমরা উন্নত হইয়া যাও–হাদীস শরীফে এইরূপ নির্দেশ রহিয়াছে। তোমরা দুনিয়ার চাকচিক্য, আমোদ-প্রমোদ ও ধন-মানের ব্যাপারে তোমাদের চাইতে নিম্নস্তরের ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ কর, তাহা হইলেই তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের ক্বদর করিবে।

[যখন নামাজ সমাপ্ত হইবে তোমরা জমিনে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহর দান অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইবে। (সুরা জুমুয়া-১০)]

বস্তুতঃ এই কারণেই ইফ্তারের সময় এই দোয়া পাঠ করিতে নির্দেশ রহিয়াছে ঃ হে খোদা ! আমি তোমার জন্যই রোযা রাখিয়াছি এবং তোমার দেওয়া খাদ্য দ্বারাই ইফতার করিতেছি। পিপাসা মিটিয়াছে। রগগুলি ঠাণ্ডা হইয়াছে এবং আল্লাহ্'র নিকট পুণ্য নির্ধারিত হইয়াছে ইনশা-আল্লাহ্।

৫। রোযার আর একটি বৈশিষ্ট্য, ইহা মানুষের মধ্যে পরস্পর স্নেহ-ভালবাসা, মায়া-মমতা, আন্তরিকতা ও সমবেদনা জন্মায়। হাদীসে পাকে আছে, যে ব্যক্তি রোযাদার ব্যক্তিকে ইফতার করাইবে, তাহাকে রোযাদার ব্যক্তির সমান সওয়াব দেওয়া হইবে। আর যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে পেটভরে খানা খাওয়াইবে, আল্লাহপাক তাহাকে হাউজে কাওছারের পানি পান করাইবেন। অতঃপর সে জান্নাতে এমতাবস্থায় প্রবেশ করিবে যে, হাশরের ময়দানে তাহার আর পিপাসাই লাগিবে না। আর যে কেহ তাহার কর্মচারীদের সাথে নম্র ব্যবহার করিবে, আল্লাহ্পাক তাহাকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দান করিবেন।

৬। রোযার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহপাক নিজ হাতে রোযার পুণ্য প্রদান করার সুসংবাদ দিয়াছেন। ইসলামে নির্ধারিত প্রত্যেকটি ইবাদতই একমাত্র আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই হইয়া থাকে। রোযার মাধ্যমেও মানবকুল আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালায়। মানুষ যেহেতু তাহার সমস্ত কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করত বিভিন্ন যাতনা সহ্য করিয়া আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় রোযা রাখে এবং ধৈর্যের সহিত সমস্ত কষ্ট সহ্য করে, তাই সে উক্ত সৌভাগ্যের যোগ্য অবশ্যই হইতে পারে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহ্পাক বলেন, মানুষের প্রত্যেকটি কাজই তাহার নিজের জন্য, কিন্তু রোযা একমাত্র আমার (আল্লাহ্'র) জন্য। অতএব আমিই (আল্লাহ্ই) রোযার পুণ্য প্রদান করিব।

রাসূলে পাক (সাঃ) বলিয়াছেন, রোযা মানবের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। তাই যখন তোমাদের রোযার সময় হয়, তখন অশ্লীল কথাবার্তা বলিও না, অনর্থক কথা বলিও না। যদি কেহ গালি-গালাজ বা ঝগড়া করে, তবে তাহাকে বলিয়া দাও, 'ভাই আমি রোযা রাখিয়াছি।' 'ঐ খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি যার হস্তে আমার জীবন, রোযাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ মেশ্কে আম্বরের সুগন্ধি হইতেও আল্লাহ্'র নিকট অধিক প্রিয়। রোযাদারের জন্য দুইটি খুশির সময়, একটি ইফতারের মুহূর্তে, অপরটি প্রভুর সহিত তাহার যখন সাক্ষাৎ হইবে।'

অপর এক হাদীসে কুদসীতে রহিয়াছে- আল্লাহ্ পাক বলেন, বান্দা খাদ্য, পানীয়, শাহওয়াত (কামনা) সব কিছুই আমার সন্তুষ্টির জন্য পরিত্যাগ করিয়াছে। তাই রোযা আমার জন্য, সুতরাং আমিই রোযার বিনিময় প্রদান করিব।

মুসলিম শরীফে আছে, বান্দার নেকী দশ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু রোযা সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন যে, রোযা আমার জন্য, অতএব আমিই রোযার বদলা প্রদান করিব। বান্দা নিজের খাওয়া-দাওয়া, কামনার বস্তু ও খাহেশাত একমাত্র আমার জন্যই পরিত্যাগ করিয়াছে। রোযাদার ব্যক্তির জন্য দুইটি খুশির সময় একটি ইফতারের সময়, অপরটি আল্লাহ্'র সহিত তাহার সাক্ষাতের সময়। রোযাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহ্'র নিকট মেশকে আম্বরের সুগন্ধি হইতে অধিক পছন্দনীয়।

এই দুইটি হাদীসের বিষয়বস্তু এক। ইহা হইতে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, রোযাদারের সহিত আল্লাহপাকের সম্পর্ক কিরূপ হইবে এবং কি কারণে তিনি রোযার পুণ্য স্বয়ং নিজেই প্রদান করিবেন। এইখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। রোযাদারকে আল্লাহপাক নিজ হস্তে বদলা প্রদান করিবেন- ইহার অর্থ কি ? নেক কাজের বদলা প্রদানের জন্য আল্লাহপাকের দরবারে কিছু নিয়মাবলী রহিয়াছে। আল্লাহপাক মানুষের অবস্থা ও আমলের একাগ্রতার দিকে লক্ষ্য করিয়া এক এক নেকীর বদলা দশ হইতে সাত শত বা তারও বেশি বাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু রোযা উক্ত নিয়ম হইতে মুক্ত। অতএব আল্লাহপাক নিজ হস্তে রোযার অপরিসীম বদলা প্রদান করিবেন।

[হাদিসে-এ কূদসীতে আল্লাহ'তায়ালা বলেন,"রোজা আমার জন্য এবং আমি নিজেই তার পুরস্কার প্রদান করব"। (বুখারী ও তিরমিযী)]

রোযার উপকারিতা

রোযার উপকারিতা সম্পর্কে হযরত থানবী (রহঃ) বলেন ঃ প্রকৃতির দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনা করিলে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, মানুষের প্রবৃত্তির উপর আকলের পরিপূর্ণ আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অনেক সময় মানবীয় দুর্বলতার কারণে প্রবৃত্তি মানুষের আকলের উপর প্রবল হইয়া উঠে এবং আকলকে কাবু করিয়া ফেলে। এই কারণেই প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধির লক্ষ্যে আল্লাহ্পাক রোযাকে মানুষের জন্য মৌলিক বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করিয়াছেন। তাই যাহারা রোযা পালন করে, তাহাদের ভাগ্যে নিম্নোক্ত উপকারিতা লাভ হয় ঃ

(১) রোযার দ্বারা প্রবৃত্তির উপর আকলের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়।

(২) রোযার দ্বারা মানুষের অন্তরে আল্লাহ্'র ভয়-ভীতি ও তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি হয়।

(৩) রোযার দ্বারা মানুষের স্বভাবে নম্রতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও মিনতি সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ্'র মহত্ব কুদরতের অনুভূতি জাগে।

(৪) রোযার দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত হয়।

(৫) রোযার দ্বারা মানুষের মধ্যে দূরদর্শিতা জন্ম হয়।

(৬) রোযার দ্বারা মানুষের মধ্যে এক প্রকার রূহানী শক্তি সৃষ্টি হয়, যাহার দ্বারা মানুষ সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর গভীর তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়।

(৭) রোযার বরকতে মানুষ অসভ্যতা ও পশুত্বের স্বভাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে।

(৮) রোযার বরকতে ফেরেশতাদের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ হয়।

(৯) রোযার কারণে আল্লাহ্'র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ হয়।

(১০) রোযার বরকতে মানুষের ভিতর ভ্রাতৃত্ববোধ, সহনশীলতা, মায়া-মমতা ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়। কেননা, যে কোন দিন ক্ষুধার্ত বা পিপাসার্ত হয় নাই, সে কি করিয়া ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত ব্যক্তির অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিবে ? সে কেমন করিয়া রিযিকদাতার নেয়ামতের প্রকৃত শুকরিয়া আদায় করিতে সক্ষম হইবে ? হইতে পারে এমন ব্যক্তি মুখে মুখে আল্লাহ্'র শুকরিয়া আদায় করিবে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষুধা আর পিপাসার যন্ত্রণা না দেখা দেয় এবং শরীরের শিরা-উপশিরায় দূর্বলতা প্রকাশ না পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আল্লাহ পাকের নেয়ামতের উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারে না। প্রেমাস্পদ কিছুদিন দূরে থাকিলেই তাহার গুরুত্ব অনুধাবন করা সহজ হয়।

(১১) রোযার দ্বারা শারীরিক সুস্থতা লাভ হয়। অল্প-খাদ্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে শারীরিক সুস্থতার মহৌষধ। আর আধ্যাত্মিক মনীষীদের মতে ইহা অন্তরের পরিশুদ্ধির উত্তম তরীকা।

(১২) রোযা মানুষের জন্য রূহানী খাদ্যতুল্য, এই খাদ্য পরকালে কাজে লাগিবে। যে ব্যক্তি এই খাদ্যকে সাথে নিয়া মৃত্যুবরণ করিতে পারিবে না, সে পরকালে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকিবে। সেইখানে সে অত্যধিক দুর্ভিক্ষে নিপতিত হইবে। কেননা, সে তাহার খাদ্যসামগ্রী সাথে করিয়া নিয়া যায় নাই। পৃথিবীতে যাহারা মানুষকে খাদ্যসামগ্রী দান করিল এবং প্রতিপালকের নির্দেশে পানাহার বর্জন করিল, পরকালে ইহার পরিবর্তে তুলনামূলকভাবে আরো অধিক সামগ্রী তাহারা লাভ করিবে।

রোযা পালন করা আল্লাহ্'র প্রতি গভীর প্রেমের নিদর্শন। কেননা, কারো প্রতি ভালোবাসা ও প্রেম জন্মিলে তাহাকে লাভ করিবার জন্য প্রয়োজনে প্রেমিক পানাহার বর্জন করিয়া থাকে এবং স্ত্রীর সম্পর্কও ভুলিয়া যায়। ঠিক

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন- রোজা রোজাদারদের জন্য নিরাপত্তা বর্ম স্বরূপ (শয়তানের আক্রমণ থেকে)। (বুখারী ও মুসলীম)]

তেমনিভাবে রোযাদার ব্যক্তি আল্লাহ্'র প্রেমে মত্ত হইয়া সবকিছুই ভুলিয়া পানাহার বর্জন করিয়া থাকে। এই কারণেই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য রোযা পালন করা জায়েয নহে।

রোযার আধ্যাত্মিক বরকতসমূহ

১। গাফলত হইতে মুক্তি ঃ গাফলত অর্থ অলসতা। আল্লাহপাক মানবকে ফিত্রতে সালীম অর্থাৎ বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার গঠন প্রকৃতিতে দুই প্রকার শক্তির প্রয়োজন সাধন করিয়াছেন; একটি মালাকুতী শক্তি, অপরটি হাইওয়ানী শক্তি। রোযা মানুষকে আল্লাহ্'র পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার সামর্থ্য প্রদান করে এবং এতে মাশুফী স্বাদ অর্জণ হয়। ইহা প্রকৃতপক্ষে এমন একটি নূরানী শক্তি, যে শক্তির আলোকে মানুষের সমস্ত গোমরাহী বিদূরিত হয় এবং আল্লাহ্'র সহিত সম্পর্ক পয়দা হয়। আর হাইওয়ানী শক্তি নফসে আম্মারার শক্তি, সমস্ত খাহেশাতের শক্তি, ভোগ ও লিপ্সার শক্তি। যখন প্রথম শক্তির উপর দ্বিতীয় শক্তি প্রভাব বিস্তার করে, তখন মালাকুতী শক্তি পরাভূত হয়। প্রভুকে ভুলিয়া গিয়া ধ্বংসের দিকে ধাবমান হয়।

এই গাফ্লত হইতে মুক্তিলাভের বহু রাস্তা রহিয়াছে। তন্মধ্যে রোযা হইল উৎকৃষ্টতম পন্থা এবং রূহানী রোগের উত্তম চিকিৎসা। অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলামে রোযার শর্তাবলী সহজ এবং স্বাভাবিক বিধায় এই ধর্মে রোযা সার্বজনীন মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

২। নফসে আম্মারা ঃ ইহা প্রত্যেকটি মানুষকে অন্যায় ও খারাবির দিকে টানিয়া নিয়া যায় এবং মানুষকে ধ্বংসোন্মুখ করিয়া তোলে। তাই দেখা যায়, আমরা সকলেই অতি সহজে নফসে আম্মারার শিকারে পরিণত হইয়া যাই। এই কারণে অন্যান্য ধর্মেও নফসে আম্মারাকে সমূলে নিপাত করার প্রয়াস রহিয়াছে। কিন্তু যেহেতু ইসলাম স্বভাবগত ধর্ম, সেইহেতু এইখানে নফসে আম্মারাকে সমূলে নিপাত করার কোন হুকুম নাই। ইসলামের মতে মানুষ যুহদের (সাধনার) মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে নফসে আম্মারাকে পরাভূত করিবে। এইখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, নফসে আম্মারাকে সাধনার মাধ্যমে পরাভূত করা, সমূলে নিপাত করা হইতে অধিক কষ্টসাধ্য এবং কঠিন কাজ।

মাওলানা মাহ্মূদুল হাসান
মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
খতীব, গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন- আমার বান্দাদের মধ্যে তারাই আমার নিকট সবচাইতে বেশি প্রিয়, যারা তাড়াতাড়ি ইফতার করে। (তিরমিযী)]

ZIKRULLAH

The remembrance of Allah (Subhanahu Wataala: SWT), which is Zikrullah in Arabic, is a very comprehensive concept of serving (Ibadah) Allah (SWT). It means and includes practically everything that a Muslim believes, thinks, meditates, practices, does and loves, as long as all these are related to the services men owe to Allah (SWT). In a holistic sense Zikrullah covers all the aspects of Imaan, Ilm and Aamal.

Zikrullah does not pertain to the un-believers. Those who do not believe in Allah (SWT) i.e. the Kaferun, obviously do not recognize Allah (SWT). Consequently, a non-believer (a kafer) does not remember Allah (SWT), the Creator, the Sustainer and the Lord of the Day of Judgement. Some of those who profess to believe also fail to remember Allah (SWT), most of the time, in their thoughts, deeds and dealings with other creations of Allah (SWT). Addressing these neglect-prone believers, Allah (SWT) warns: "And be not like those who forgot Allah, and He made them forget themselves. Such are the rebellious transgressors (Fasequn). [Surah Al-Hashr. Ayat 19]

Allah (SWT) will not remember the Fasequn in His special grace, mercy and love. Without the protection and support of basic level of grace, mercy and benediction from Allah (SWT) nothing or no being can exist or survive in this world, and for that matter in the entire universe. But the special grace and love of Allah (SWT) would be another dimension of divine mercy with which the Kaferun and the Fasequn will not be blessed.

Allah (SWT) special grace, mercy and love will be the cardinal factors of deliverance on the Day of Judgment. The transgressors (Fasequn) and the non-believers (Kaferun) will not merit these special blessings on that dreadful Day. The universal grace of Allah (SWT) is showered on all people, believers and non-believers alike, before they meet their mortal destiny.
Those who remember Allah (SWT) may merit the very special grace, mercy and forgiveness of Allah and will be able to carry these precious spiritual dividends to the transcendental world beyond the horizon of death.

The concept of remembrance of Allah (SWT) or Zikrullah is a very inclusive and comprehensive one. Islamic scholars and saints have visualized Zikrullah in the light of their respective level of knowledge, religious experience and spiritual enlightenment.

Those who depend more on knowledge acquired from study of books tend to define Zikrullah in a more literal sense. According to the understanding of this school, Zikrullah is a product of normal perceptive faculties. Tasbih (recitation of Subhan allah), Tahlil (recitation of La Ilaha Illallah), and Tahmid (recitation of Alhamdulillah) are the usual forms of Zikrullah.

[রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন - যখন বান্দা রোগে আক্রান্ত হয় অথবা সফর করে আর নিজের নিয়মিত অযীফা আদায় করিতে না পারে তাহার জন্য তাহাই লেখা হয় (সাওয়াব) যাহা সে সুস্থ অবস্থায় যা বাড়ীতে করিত। (বুখারী)]

Chanting these important expressions are useful even if the mind and soul do not become deeply involved and engrossed in the sublime aspects of Zikrullah.

The Sufis and saints, who are the denizens of supreme spiritual domain, tend to depend more on knowledge conferred on them as a special divine grace from Allah (SWT). Acquired knowledge is surpassed in degree of excellence by the direct divine knowledge specially gifted by Allah (SWT) in His infinite mercy. The Prophets were the highest level of beneficiaries of this spiritual knowledge. Some Sufis and saints also receive a measure of this divine gift of knowledge. In the light of this special endowment of conferred knowledge the Prophets invite humanity towards Zikrullah. The Sufis and saints attain a sublime perception of Zikrullah in the context of his received knowledge. For them the entire space of their spiritual awareness and divine consciousness get absolutely permeated by a very high level of ardent love for Allah (SWT). Hence the light of abiding love for Allah (SWT) emanates out of their ultimate expression of Zikrullah.

The enthralling spiritual adventure into the magnificent world of Zikrullah starts with Imaan. Unqualified and unswerving faith in Allah, His Absolute Unity, His Supreme Divinity and His All Pervasive Power becomes the most precious asset of traveler in the path of Zikrullah. The stronger the Imaan, the more secure is the solitary traveler in the path of spiritual advancement. Imaan becomes both a means as well as an end for devout seeker of love of the Creator and the Master of the Day of Judgement. Zikrullah is not only the cause but also the effect of progressively higher levels of Imaan reached by a devotee of Allah (SWT) as he patiently struggles along the path of spiritual attainments. Unfortunately this glorious path is less traveled.

'Salat' is the next best manifestation of Zikrullah. Allah (SWT) says, "… and establish regular prayer for My remembrance". [Surah Ta Ha, Ayat 14]. 'Salat' is the second best manifestation of remembrance (Zikr) of Allah (SWT), after Imaan. It signifies an intense personal communion of the believing soul with the Lord and the Master. The singular importance of prayer (salat) has been emphasized as many as eighty two (82) times in the Holy Quran. In Surah Ankabut at Ayat 45, Allah's (SWT) commandment is very emphatic, "…establish regular prayer (salat), for 'Salat' restrains from shameful deeds, and remembrance of Allah is the greatest (thing of life) without doubt …"

Allah (SWT) in His infinite mercy has ordained a divine right of the poor in the surplus wealth of a rich believer. When the devout believer discharges his obligations relating to Zakat and delivers the share of the poor to the poor, the believer accomplishes the duty ordained by Allah (SWT). In the act of paying Zakat, the believer remembers Allah (SWT) and the duty

[রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ রোজা এবং কোরআন কিয়ামত দিবসে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে রব ! আমি তাকে পানাহার ও কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তুমি তার ব্যাপাওে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর। (আহমাদ)]

enjoined by Allah (SWT) relating to purification of wealth. Zakat thus becomes yet another significant means of remembrance of Allah (SWT).

For the sake of Allah (SWT), a believer abstains from food, drinks and some otherwise halal (permissible under Sharia law) activities of life during the day time. This is 'Siam' (formal abstention), which is much more than mere fasting. Doing ones duty to Allah (SWT) is an important expression of Zikrullah. 'Siam' is among the noblest form of remembrance of Allah (SWT). The soul gets sanctified and purified through the discipline-bound exercise of Siam. The remembrance of Allah (SWT) is specially highlighted during the month of Ramadan through Siam and Salatul Tarabih.

"I am here, Allah I am here. I am here. There is no partner with you. I am here. Certainly belong to you all praises, all goodness and all powers. There is no partner with you, so chant the Hajis during the performance of Hajj. The believers throng the blessed valley of Arafat and seek the grace, mercy and forgiveness of Allah (SWT) through day-long prayers. Hajj is thus a beautiful act of remembrance of Allah (SWT).

In addition to these obligatory forms of remembrance of Allah (SWT), the devout believers remember Allah (SWT) in all their thoughts, deeds and meditations. "They (the people with wisdom) remember Allah, while they are standing, sitting and lying." [Surah Al-Imran, Ayat 191]. This comprehensive remembrance of Allah (SWT) manifests itself in all the worldly activities of a believer. He remains very conscious about the commandments of Allah (SWT) when baser instincts to lie, to rob, to short-change in a deal, to betray on promises, and to break a trust etc. try to subsume his sense of propriety, goodness and sense of justice. He prays for help from Allah (SWT) to protect himself against the onslaught of baser forces within himself. He fears Allah (SWT) and hopes for Allah's (SWT) mercy and help. The believer refrains from doing things forbidden by Allah (SWT). He helps the creations of Allah (SWT) for the sake of Allah (SWT). This is the true significance of genuine Zikrullah in the context of mundane world and the instinctive incitements of greed, hatred, vengeance and violence.

"Remember Me, I will remember you". [Surah Al-Baquarah Ayat 152], so reassures Allah (SWT) the true believers. Allah (SWT) offers special grace and succor to the practicing believers. Way laid by fear, anger and kufur, the believer remembers Allah (SWT) for help and deliverance against the enticements of Nafs-e-Ammara (the baser soul surfeited with animal instincts). Allah (SWT) holds out the hope of His special help and grace in the struggle (Jihad) of the devout believer against the baser elements in him. In this respect Jihad against all wrongs and denial of justice becomes a novel form of Zikrullah.

[রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তম রূপে ওযু করিয়া সওয়াবের উদ্দেশ্যে তাহার কোন মুসলমান ভাইকে দেখিতে যাইবে তাহাকে জাহান্নাম হইতে ষাট বছরের পথ দূরে রাখা হইবে। (মুসলীম)]

The believers are exhorted to sincerely remember Allah (SWT) in their prayers, in their Istigfars (seeking forgiveness of Allah), in their dealings with other creations including fellow human beings, in managing their own life, physical, mental and spiritual and in their innermost reflections. Allah (SWT) reconfirms, He will remember these devout believers in the dispensation of His special grace, mercy, help and forgiveness. Thus remembrance of Allah (SWT) i.e. Zikrullah, is elevated to a quintessential level of spiritual accomplishment. "Remember Allah as much as you can." [Surah Ahzab, Ayat 41] so admonishes Allah (SWT) the believers.

Reciting the Holy Quran is one of the best ways of remembering Allah (SWT). Knowing the divine message of Allah (SWT), understanding its meanings, reflecting on the significances of the eternal message and above all translating Allah's (SWT) commandments in terms of real life practices, doing what Allah (SWT) commands to do and to refrain from what Allah (SWT) forbids, all these collectively and individually constitute practical manifestations (i.e. Amaal) of Zikrullah. Just chanting the name and divine attributes of Allah (SWT) would be a mere lip service, unless the believer puts into practice what Allah (SWT) ordains either through the Holy Quran or through the Holy Prophet (Sallallahu Alaihe Wa Sallam: SAWS).

Zikrullah is the most important factor for spiritual empowerment of the Soul. The soul is created with the intrinsic nature of yearning for the proximity and grace of Allah (SWT). "for without doubt in the remembrance of Allah do souls final satisfaction". [Surah Al-Raad. Ayat 28]. Sincere remembrance of Allah (SWT) is the ultimate essence of all devotional services (Ibadaat) of a believer. Devout remembrance of Allah (SWT) ennobles the inner spiritual experience of the believer and elevates the 'Nafs' (Soul) to the highest level of 'Nafs-e-Mutmainna' (the soul at divine level of contentment and holy bliss). At his ultimate state of spiritual advancement the 'Nafs-e-Mutmainna' is invited to the abode of perpetual peace and divine bliss, "O (thou) soul in (complete) rest and satisfaction ! come back thou to thy Lord well pleased (thyself) and well-pleasing into Him. Enter thou, then, among My devotees, yea enter My Heaven." [Surah Al-Fajr. Ayat 27-30]. May Allah (SWT) grant us the level of Imaan, knowledge (Ilm) and Ammal (religious practice), so that we can merit Allah's (SWT) special grace, mercy and forgiveness through Zikrullah.

Mufleh R. Osmany
Former Ambassador, Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Govt. of Bangladesh
Member, Executive Committee, Gulshan Central Masjid & Iddgah Society.

মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রসঙ্গ, মধ্যপন্থা, জেহাদ ও রেনেসাঁ

আল্লাহপাক স্বয়ং মুসলমানদের উদ্দেশ্যে সূরা আল ইমরানের ১১০ নং আয়াত দ্বারা ঘোষণা করেছেন ঃ " তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত-মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে" । "শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়" ঘোষণা করার কারণসমূহ কুরআনে একাধিক আয়াতে বর্ণিতও হয়েছে । সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য আয়াত সূরা বাকারায় এসেছে । যেখানে আয়াতের ব্যাখ্যায় - মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ মধ্যপন্থী হওয়া এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যপন্থার পূর্ণ বিবরণও সেখানে প্রদত্ত হয়েছে । (সূত্র-মারেফুল কুরআন-১ম খণ্ড) "ওয়াকাজালিকা জাআলনাকুম উম্মাতাও ওয়াসাতা" অর্থাৎ "এমনিভাবে আমি তোমাদিগকে (মুসলমানদেরকে) মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি" । (সূরা বাকারা-১৪৩) জীবনের সবক্ষেত্রে ইসলাম মধ্যম সুষম পন্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেছে । আর এটাই সিরাতুল মুস্তাকিম বা সরল পথ, আর এ পথের বিপরীত যত মত তার সবই গজবে পতিত । মুসলিম উম্মাহকে হতে হবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পন্থার পথিক । মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সবদিক থেকেই মধ্যপন্থীর শ্রেষ্ঠতম মডেল । কস্মিনকালেও তিনি উগ্রপন্থী ছিলেন না-এবং প্রয়োজনে নরমপন্থাও আকড়ে থাকেন নি । তিনি বলেছেন ঃ "মধ্যপন্থীরা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম পর্যন্ত জ্ঞানের পতাকা বহন করে নিয়ে যাবে । রক্ষা করবে জ্ঞানকে অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির হাত থেকে" । নবীজীর (সাঃ) শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পারিনি-বিসর্জন দিয়েছি জ্ঞান অর্জনকে । অথচ কুরআনের প্রথম শব্দ হিসেবে নাজিল হয়েছে "ইকরা" অর্থাৎ পড় (জ্ঞান অর্জন কর) । ইতিহাস সাক্ষী-সপ্তম শতক থেকে প্রায় ১০০০ বছর ইসলামই দুনিয়ায় জ্ঞানের ভাণ্ডার বিলিয়েছে । প্রতিষ্ঠা করেছে রাষ্ট্রাচার-মানবিক যুদ্ধনীতি ও কল্যাণমুখী সংবিধান । জ্ঞান-বিজ্ঞান-রাষ্ট্র-সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি-চিকিৎসা-জীবন-আচরণ-পদ্ধতি সব কিছুতেই মুসলিম মনীষীরা অবদান রেখে গেছেন । কয়েক লক্ষ পৃষ্ঠার চিকিৎসা সংক্রান্ত থিসিস যা ইবনে সিনা প্রণয়ন করেছিলেন-তা কি বিশ্ব আজও পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পেরেছে ? শূন্যের (০) আবিষ্কার ও এর প্রয়োগে গণিতে যে বিপ্লব তা কি মুসলিম মনীষার দ্বারা হয়নি ? 'এলজাবরা' (বীজগণিত) আবিষ্কার কে করল ? পৃথিবীর যে মানচিত্র মুসলিম জ্যোতির্বিদরা প্রণয়ন করেছিলেন- তাকি আজও চালু নেই- কোন ভুল কি ধরা পড়েছে ?

পশ্চিমা মিডিয়া থেকে শুরু করে গোটা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সকল পাত্র-মিত্ররা আজ সবচেয়ে বেশি মতাদর্শিক আক্রমণ তথা অপপ্রচার চালাচ্ছে জেহাদের বিরুদ্ধে । কেননা, গবেষণায় তারা দেখেছে যে এটা ইসলামের এক অন্তর্নিহিত শক্তি । হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতে "জেহাদ ফরজ" (বুখারী) । জেহাদ বা সংগ্রাম-সর্বাগ্রে নিজের রিপুর বিরুদ্ধে-নফসের বা মনের অসৎ চাওয়া-পাওয়ার বিরুদ্ধেই মুসলমানকে করতে হয় নিরন্তরভাবে এবং এটা একটা ইবাদত । যার তাগিদ বারবার এসেছে কুরআন মজিদে ও হাদীসে পাকে । প্রকৃত প্রস্তাবে জিহাদ হলো অবিচারের বিরুদ্ধে এক ন্যায় যুদ্ধ এবং মূলত কোন নিদিষ্ট-ভূখণ্ডের অথবা সংঘবদ্ধ কোন জাতি-গোষ্ঠীর স্বীকৃত নেতার তরফে জিহাদের ঘোষণা আসতে হয় । কোন প্রান্তিক দলের কাছ থেকে এ ঘোষণা আসতে পারে না । মহানবী (সাঃ) পীড়নের কঠিনতম দিনগুলোতেও মক্কায় অস্ত্র তুলে নেননি । বরং হিজরত করে অন্য শহর-মদীনায় চলে গেছেন । কিন্তু তারপরেও কাফেরগণ আক্রমন বন্ধ রাখেনি । এভাবে বিশ্বাসীদের জীবন যখন বিপন্ন এবং সর্বোপরি যখন একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের টিকে থাকার প্রশ্ন এলো–ঠিক তখনই গৃহীত হলো সশস্ত্র পন্থা । আসলে যুদ্ধ বিষয়ক আয়াত তখনই নাজিল হলো-যখন বিশ্বাস ভঙ্গ করার জন্য নির্যাতনের পথ কাফেররা বেছে নিয়েছিলো । মহানবী (সাঃ) এবং সাহাবীগণ বাধ্য হয়ে অস্ত্র তুলে নেন । তদুপরি সেই দেড় হাজার বছর আগে জিহাদ বিষয়ে যেসব বিধান প্রণীত হয়েছিল, সভ্যতা তথা মানবতার বিচারে আজও তা কেউ

[রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ঋণকে কুফুরির সমতুল্য মনে করতেন । (নাসায়ী, তারগীব-তারহীব)]

অতিক্রম করতে পারেনি। জেহাদেই প্রথম স্পষ্টভাবে নারী-শিশু-বৃদ্ধ এবং নিষ্পাপদের হত্যা না করার বিধান জারি হলো। এমনকি ফলজ গাছ পর্যন্ত ধবংস করা যাবে না বলে নির্দেশ এলো। ইতিহাস সাক্ষী ঃ প্রতিটি জিহাদ মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত কিন্তু মুসলমানদের দ্বারা সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধই জিহাদ নয়। অথচ খ্রীস্টানদের ধর্মযুদ্ধ যা-ক্রুসেড হিসেবে পরিচিত-তা বরাবরই "বর্বর ধর্ম হিসেবে ইসলামকে" তুলে ধরতে জিহাদকে সামনে নিয়ে আসে।

ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা জানি, ফ্রেডরিক (১১২৩-১১৯০) যখন ক্রুসেডের সূচনা ঘটালেন তখন মিসরের মুসলিম শাসনকর্তা (সুলতান) তাকে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক একটি ঘড়ি (এস্ট্রনমিক্যাল) উপহার দিয়েছিলেন। আর এই ঘড়িটিই খুলে দিল ইউরোপের জ্ঞানের দ্বার। অনাবিষ্কৃত-শীতার্ত ও অন্ধকারে নিমজ্জিত এক আধা সামন্ত-আধা দাস ভিত্তিক মূল্যবোধের ইউরোপে তখনও পর্যন্ত না রচিত হয়েছিল কোন কালজয়ী সাহিত্য, না ছিল বিজ্ঞানের কোন জ্ঞান-না ছিল জনগণের কোন মৌলিক অধিকার। এমনকি না ছিল কোন ভদ্রজনোচিত খাদ্যাভ্যাস তথা মর্যাদাকর জীবন যাপন প্রণালী। এভাবেই এক সময় শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী মহান উত্থানের ঊষালগ্নে সূচিত হলো ইউরোপীয়॥ রেনেসাঁ। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-গণতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতা- জাতীয়তাবাদ ইত্যকার সব বৈপ্লবিক চেতনা প্রবেশ করল জন মানসে। ক্বপমণ্ডূক খ্রিস্টীয় পাদ্রী তন্ত্রের হাজার বছরের শৃঙ্খল আর বিবেকহীন সামন্ত ভূস্বামীদের পীড়নমূলক শোষণ যন্ত্রটিকে রেনেসাঁর জোয়ারে ভাসিয়ে নিল কালজয়ী সাহিত্য ও জনমানসের উন্নত সাংস্কৃতিক কৃষ্টি। আর সমগ্র এ উত্থানটি মাত্র ৬০০ বছর আগের। স্বপ্নের ও স্বাদের আমেরিকা তখনও অনাবিষ্কৃত-রাণী ইসাবেলা ও কলম্বাস কেউ জন্মই নেননি। কেবল ভাইকিং নাবিকেরা মাঝে মধ্যে আতলান্তিক পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করে আমেরিকার আদি মালিক রেড ইন্ডিয়ানদের না-হক কষ্ট দিত। অথচ প্রায়শই আমাদের শুনতে হয় এমনকি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাও নাক সিঁটকান–ইসলামে কোন রেনেসাঁর পর্ব নেই। সবিনয়ে জানাই, রেনেসাঁর আপনাদের দরকার হবে তখনই-যখন একটি অন্ধকার যুগ আপনি পেরিয়ে আসবেন। অন্ধকার থাকলেই তো আলোর প্রয়োজনীয়তা। সুসভ্য ফ্রান্স আর ঐতিহ্যবাহী ইংল্যান্ডে যখন একটি মাত্র স্কুলও চালু হয়নি তখনও (হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরিচর্যায় বেড়ে উঠা আর হযরত আবদুল্লাহ-ইবনে-মাসউদ (রাঃ) ও ইমামে আজম আবু হানিফা (রহঃ) থেকে বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) সহ অসংখ্য মুসলিম মনীষার পদস্পর্শে ধন্য) বাগদাদে ছিল শত শত বইয়ের দোকান আর লাইব্রেরি। বলা হয়, মঙ্গলরা যখন বাগদাদ ধবংস করেছিল টাইগ্রিস নদীর অর্ধেক লাল হয়ে গিয়েছিল মুসলমানদের পবিত্র রক্তে-আর বাকি অর্ধেক বইয়ের কালো কালিতে।

১৪০০ বছরেরও বেশি ইসলামের বয়স-আর গণতন্ত্র তার সহজাত অন্য মূল্যবোধগুলো নিয়ে এ পর্যায়ে এলো মাত্র বিংশ শতাব্দীতে। যুগ যুগ ধরে ইসলাম শান্তির সব শর্ত পূরণ করেছে। সভ্যতা নির্মাণ করতে সর্বোচ্চ মেধা ও শ্রম বিনিয়োগ করেছে গাজী সালাহউদ্দিন আর মহাবীর তারেকরা। তরবারীর ডগায় ইসলাম বিকশিত হয়নি। যদি সত্যি তাই হতো-আজকের স্পেনে কোন খ্রিস্টান থাকত না। ককেসাস অঞ্চলজুড়ে প্রায় ৮০০ বছরের মুসলিম শাসনে ইহুদিদের বিস্তার ঘটতো না। ইসলাম জবরদস্তি বরদাশত করে না (বাকারা-২৫৬)। জিজিয়া করের বিধান এনে বিধর্মীদের সাথে সহাবস্থানের নীতি ইসলাম কর্তৃকই প্রবর্তিত হয়েছিল। ইসলামের সমূহ সত্যের বৈপ্লবিক অনিবার্য উত্থানে ভীত হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিকশিত নতুন বিশ্বমতবাদ-পুঁজিতন্ত্র নতুন আঙ্গিকে-নবতর কৌশলে ইসলামের সাথে মতাদর্শিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। খ্রিস্টীয় ক্রুসেড সামন্তবাদের ফসল পুঁজিবাদের বৈপ্লবিক উত্থানের বিশেষত শিল্প বিপ্লবের পর পুঁজিবাদ যখন গায়ে-গতরে আরো বৃদ্ধি পেয়ে সভ্য-সংস্কৃতিমনা হয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে ও পর্বে প্রবেশ করল (যেটাকে-কাল মার্কস ও ভ.ই.লেলিন-পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন) তখনই শুরু হলো ধর্মের বিরুদ্ধে এক অপ্রকাশ্য যুদ্ধ। সামন্ততন্ত্র ও তার জাতিভাই

[রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন - যে ব্যক্তি ক্রয় বিক্রয়ে প্রতারণা করে সে আমাদের দলের নহে (মুসলমানদের দলের নহে)। (মুসলীম)]

পাদ্রী অর্থাৎ সামন্ত রাজাও ভূস্বামী এবং চার্চের পাদ্রীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে পুঁজিবাদ ইউরোপে নিয়ে এসছিলো রেনেসাঁ-যার প্রয়োজনীয়তা ছিল সর্বোচ্চ ও অনিবার্য। ইউরোপের রেনেসাঁর বহু শতাব্দী আগেই ইসলাম দুনিয়ায় আলো (রেনেসাঁ) নিয়ে এসেছিল সেই সপ্তম শতকেই। তবে এটাই ধ্রুবসত্য যে-দাসযুগে সূচিত (৬১০ ঈসায়ী সালকে ধরে) মহান ইসলাম শৃঙ্খলের সকল শেকলই শুধু ভাঙ্গেনি-দুনিয়া জুড়ে নিয়ে এসেছিল শিক্ষার মূল মর্মবাণী-রাষ্ট্র পরিচালনার ১ম নীতিমালা-সমাজ গঠনের সুকৌশল-ব্যবস্থাপনা-এমনকি ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের সকল আচার-পদ্ধতি-লেনদেন-চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কাঙ্ক্ষিত সব মডেল। এদিকে পুঁজিবাদেরই গর্ভে মাত্র শ'খানেক বছর আগে জন্ম নিল আরেক বিপ্লবী শিশু যার নাম-সমাজতন্ত্র।

ধর্ম প্রসঙ্গে যার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আরো দু'ধাপ নেতিবাচক। তখন পুঁজিতন্ত্র তথা বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী চক্র সার্থক এক কৌশল গ্রহণ করল। ইসলামের সাথে মতাদর্শিক সংগ্রামটা সমাজতন্ত্রের সাথে লাগিয়ে দিল-আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসেবে ইসলামের বৈপ্লবিক উত্থানকে দাবিয়ে রাখার জন্য দুনিয়ার দেশে-দেশে মুসলিম রাজন্য ও স্বৈরাচারকে লাগাতার মদদ যোগাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই পশ্চিমা এজেন্সিগুলো স্বয়ং বিপথগামী কিছু তরুণ র‍্যাডিক্যাল এবং কোথাও কোথাও হতাশাগ্রস্ত যুবগোষ্ঠী আর কোথাও শর্টকাট পথে "বেহেশতকামী স্বপ্নাভিসারীদের"-দূর থেকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে গড়ে তুললো তথাকথিত জঙ্গিচক্র-যাতে ইসলামকে "উগ্র" পশ্চাতমুখী বর্বর "হিংস্র" তাবতসব নেতিবাচক বিশেষণে বিভূষিত করা যায়। এদিকে নব্বইয়ের দশকে আকস্মিকভাবে সমাজতন্ত্রের পতন শুরু হয়ে গেলে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বচক্র নিজেই সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিল। গোটা বিশ্ব পুঁজিচক্র-পারমাণবিক শক্তি ভাণ্ডারসহ নতুন যে মারণাস্ত্র নিয়ে আজ রণাঙ্গনে সমূর্তিতে আবির্ভূত তার আরেক নাম মিডিয়া। যার চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ-পৃথিবীর সবচেয়ে সংখ্যালঘু অথচ সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি-ইহুদিদের কব্জায়।

মুসলমানদের সামগ্রিকভাবে আজ এসকল তথ্য ও তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে-উগ্রতা পরিহার করে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। নিজেদের বেঁচে থাকার স্বার্থে-অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে। ত্যাগ করতে হবে সব ধরনের-মূর্খতামূলক গোঁড়ামি। বর্জন করতে হবে আধুনিকতার নামে সব ধরনের পশ্চিমা অসভ্যতাকে। পাশাপাশি অর্জন করতে হবে আধুনিকতার ইতিবাচক নির্যাসকে। ইসলাম কোন কালের-সময়ের বা স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়-সে শাশ্বত-সর্বাঙ্গীণ সত্য ও সামগ্রিকভাবে সুন্দরতম এক বিশ্ব ব্যবস্থা। সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা-মহান রাব্বুল আলামীন-পৃথিবীর লিখিত ইতিহাসে আদর্শতম মানুষ-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানব জাতির জন্য যে জীবন ব্যবস্থা কুরআন-হাদীসের ভেতর রেখেছেন-কেবলমাত্র এবং একমাত্র তাকে পূর্ণাঙ্গভাবে ধারণ করার মধ্যদিয়েই-মুসলমান মুক্তির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে এবং দুনিয়ায়ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কাঙ্ক্ষিত শান্তি। শান্তির এ শর্ত পূরণে সবচেয়ে বেশি আজ যা প্রয়োজন তা হলো আরো বেশি বেশি মেধা ও শ্রম দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত এক মধ্যম সুষম-ভারসাম্যপূর্ণ পন্থাকে জান-মাল দিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। তুলে ধরা ইসলামের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ।

এ কে এম নূরুল ফজল বুলবুল
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, এক্সিম ব্যাংক, এফবিসিসিআই এবং সিডিবিএল
সেক্রেটারী জেনারেল- ইসলামিক রিসার্চ সোসাইটি বাংলাদেশ

[রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেন - হে আদম সন্তান ! তুমি (আমার অভাবী বান্দাদের জন্য) খরচ কর, আমি তোমার উপর খরচ করবো। (বুখারী ও মুসলীম)]

আধুনিক জীবন ও ইসলাম

আধুনিক জীবন, আধুনিক যুগ বা আধুনিকতার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেয়া মোটেই সহজ নয়। আধুনিকতা একটি আপেক্ষিক ব্যাপারও বটে। একজনের নিকট যা আধুনিক অন্য জনের নিকট তা আধুনিক নাও হতে পারে। তবে প্রচলিত ও সাধারণ অর্থে আধুনিক বলতে পাশ্চাত্য জীবনধারা ও জীবন দর্শন প্রভাবিত জীবন ও যুগকেই বোঝানো হয়ে থাকে। রেনেসাঁ, ফরাসি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার এবং জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে মানুষের অবাধ বিচরণের ক্ষমতা অর্জন, প্রকৌশল ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানুষের অসাধারণ উৎকর্ষতা লাভ, নানা রকম দার্শনিক তত্বের উদ্ভাবন ইত্যাদির প্রভাবে জীবন যে এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে তাই আধুনিক জীবন। প্রকৃত পক্ষে আধুনিক জীবন হলো নিজেকে ও জগৎকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার নববলে বলীয়ান মানব জীবনের এক নতুন রূপ। রাজনৈতিক, আদর্শিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক তথা জীবনের সর্বস্তরে আধুনিকতার প্রভাব পরিব্যাপ্ত।

আধুনিক জীবনের সংজ্ঞায়ন কঠিন হলেও নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে জীবনের আধুনিক রূপকে উপলব্ধি করা যায়। আধুনিক জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে তথা ব্যক্তিস্বাধীনতা, আইনের শাসন, মুক্ত চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার, মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা, জীবিকা অর্জনে সমান সুযোগ, ব্যাপক শিল্পায়ন ও নগরায়ন, যোগাযোগ ও প্রচার মাধ্যমের ব্যাপক উন্নতি, নতুন মূল্যবোধের জন্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসাধারণ উন্নতি, বিজ্ঞানমনস্কতা, গতিশীলতা, সহনশীলতা, প্রযুক্তিপ্রিয়তা ইত্যাদি। এসব ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি আধুনিক জীবনের অনেকগুলো নেতিবাচক দিকও রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

ধর্মনিরেপেক্ষতা ও নৈতিকতা বিবর্জিত জীবনবোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা, অর্থনৈতিক সুবিধাদি কুক্ষিগত ও শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি, উন্নত প্রচার মাধ্যমের অধিকারীদের হাতে দরিদ্র জনগণের বন্দিদশা, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরিবারের ভাঙ্গন, মুক্ত চিন্তার নামে অশ্লীলতার প্রসার, উন্নত প্রযুক্তির অপব্যবহারে মানব অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া, জীবনের জটিলতা, অস্থিরতা, উত্তেজনা ও হতাশা ইত্যাদি বৃদ্ধির কারণে নতুন নতুন রোগের জন্ম ও নেশাগ্রস্ততা বৃদ্ধি পাওয়া, ভোগবাদী জীবন দর্শনের প্রসারের ফলে নানাবিধ মানবিক ও সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি ইত্যাদি। বস্তুত আধুনিকতার প্রচণ্ড শক্তিকে নিয়ন্ত্রণকারী কোন বস্তুর অভাবে অনেক সময় এর ইতিবাচক দিকগুলোর তুলনায় নেতিবাচক দিকগুলো বেশি করে প্রকট হয়ে ওঠে। একমাত্র ইসলামই পারে এ ধরনের নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকা পালন করতে। এখানেই ইসলাম ও আধুনিক জীবন বা আধুনিকতার মাঝে সম্পর্কের শুরু।

ইসলাম চির আধুনিক। ইসলাম জগতের সামনে যে জীবন দর্শন, জীবনবোধ ও জীবন পদ্ধতি পেশ করেছে তা চিরদিন মানুষকে আধুনিক জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ করবে। আধুনিকতার মূল কথা হলো মানুষকে যাবতীয় বন্ধন ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে তাকে একটি অনুসন্ধিৎসু ও মুক্তমনের অধিকারী করে সৃষ্টি জগতের রহস্য উদঘাটন করে নব নব আবিষ্কারের মাধ্যমে নিজের ও জগতের সবার কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে তাকে উৎসাহিত করা। ইসলাম মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বা আশরাফুল মাখলুকাত বলে ঘোষণা করে তাকে যাবতীয়

[রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন - যখন কোন মুসলমান তাহার কোন রোগী মুসলমান ভাইকে দেখতে যেতে থাকে, তখন সে বেহেশতের পথে চলতে থাকে যতক্ষণ না সে প্রত্যাবর্তন করে। (মুসলীম)]

সৃষ্ট বস্তুর অধীনতা থেকে মুক্ত করে জগতের সব কিছুর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে সুন্দরভাবে জীবিকা অর্জন ও জীবন যাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। সুরা বনী ইসরাইলের ৭০ নং আয়াতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

"আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি, তাকে জলে স্থলে আধিপত্য দান করেছি, তার জন্য পবিত্র ও সুন্দর জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করেছি এবং জগতের অনেক কিছুর উপর তাকে প্রাধান্য দিয়েছি।" ইসলামের এ আধুনিক জীবনবোধে উজ্জীবিত হয়ে মুসলমান আলেম ও বিজ্ঞানীগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। পবিত্র কোরআন ও হাদীসের অনেক বাণী তাঁদেরকে এ কাজে উৎসাহিত করেছে। সৃষ্টি জগতের রহস্য উদঘাটন করে আল্লাহ তায়ালার কুদরতী শক্তি অনুধাবন করা এবং এর মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ সাধন করার জন্য পবিত্র কোরআনের অনেক আয়াতে সরাসরি তাগিদ দেয়া হয়েছে। এক হাদীসে জ্ঞান সাধনের কালিকে শহীদের রক্তের চেয়ে উত্তম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক যুগ ব্যাপী মুসলিম মনীষী ও বিজ্ঞানীদের সাধনার ফল নানাভাবে পাশ্চাত্য জগৎ কর্তৃক সমাদৃত হবার ফলেই সেখানে আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও জীবনবোধের উন্মেষ ঘটে। অতএব আধুনিক জীবনের ভিত্তি মুসলমানদের হাতেই রচিত হয়। জ্ঞান সাধনে পরবর্তীতে পিছিয়ে পড়ার কারণে অনেক আপন বিষয়ও মুসলামনদের নিকট অপরিচিত মনে হয়। যত অপরিচিতই মনে হোক না কেন, ইসলামের কোন শি্ক্ষা যদি আধুনিক যুগে নতুন করে মুসলমানদের সামনে আসে তবে সেটা তাদের কাছে অবশ্যই সমাদৃত হওয়া উচিত। কেননা এটা তো আমাদেরই হারানো ধন যা আমরা ফিরে পেয়েছি। এক হাদীসে বলা হয়েছে, "জ্ঞান-বিজ্ঞান মোমেনের হারানো ধন, যেখানেই পাওয়া যাক না কেন তার যোগ্য অধিকারী হলো ঈমানদার মুসলিম।" এজন্যেই কোরআন ও হাদীস না হয়েও একথাটি মুসলিম সমাজে বহুল প্রচারিত যে জ্ঞানের অন্বেষণে প্রয়োজনে সুদূর চীনেও যেতে হবে।

তবে ইসলামী আধুনিকতা ও প্রচলিত বা পাশ্চাত্য আধুনিকতার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্য আধুনিকতা মানুষকে যেখানে সীমাহীন, লাগামহীন ও উদ্দেশ্যহীন মুক্তি ও স্বাধীনতা দিয়ে তাকে স্বেচ্ছাচারিতার দিকে ঠেলে দেয়– ইসলাম সেখানে মহান স্রষ্টার বিধি নিষেধ ও রাসূলে করীম (স.)-এর আদর্শের অনুপম পরশ এবং মানুষের কল্যাণ সাধনের অকৃত্রিম ব্রতে মানুষের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কেননা নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা পরিণামে মানুষের কল্যাণের পরিবর্তে ধ্বংস ডেকে আনে। পবিত্র কালেমায়ে তাইয়্যেবায় মানুষকে সৃষ্ট জগতের যাবতীয় বন্ধন থেকে মুক্ত করে আলাহ্ ও রাসূলের নিয়ন্ত্রণে আনার অমোঘ বাণীই বিধৃত হয়েছে। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্" র প্রকৃত তাৎপর্য এটাই।

পাশ্চাত্য ও আধুনিক জীবনের নেতিবাচক দিকগুলোর বর্জন ও প্রতিরোধের সাথে সাথে এর ইতিবাচক দিকগুলো সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এর কোনটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্য মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর এবং ইসলামী মূল্য ও জীবনবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এসবের অনেক দিক রয়েছে যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর, কল্যাণকর ও মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বলে মনে হলেও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে এগুলো একটি বিশেষ পরিবেশ ও মূল্যবোধের আবেশে উদ্ভাবিত ও লালিত বলে আমাদের জন্য মোটেই কল্যাণকর নয়। এধরনের বিষয়গুলো হয় একেবারেই বর্জনীয়, নয়তো পরিশীলন ও পরিমার্জনের মাধমে গ্রহণীয়। এক সময় মনে করা হতো যে আধুনিক জীবনের আদর্শগত দিক নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন থাকলেও এর বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত দিকটা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা যায়। কিন্তু আজ একথা প্রমাণিত সত্য যে আধুনিক প্রযুক্তির সবটুকুই বিনাদ্বিধায় গ্রহণীয় নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পাশ্চাত্য দর্শনের ন্যায় পাশ্চাত্য প্রযুক্তিও নানা বিবেচনায় আমাদের জন্য ক্ষতিকর। সে জন্য উভয় ক্ষেত্রেই পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

[রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন - কেয়ামতের দিন আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে তারা, যারা আমার উপর বেশি করে দরুদ পাঠ করে। (তিরমীযী)]

অপব্যবহারের কারণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিও কেমন করে মানুষের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় তার একটি উদাহরণ হলো অতি সম্প্রতি খ্রিস্টান ধমগুরু পোপ দ্বিতীয় জন পল কর্তক আধুনিক প্রচার মাধ্যমগুলোকে পাপাচারের হাতিয়ার রূপে বর্ণনা করা। এর অন্য একটি নজির হলো আধুনিক সর্বশেষ প্রযুক্তি ও মেধার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃত মানবধ্বংসী মারণাস্ত্রসমূহকে অকল্যাণকর বিবেচনা করে সেগুলো ধ্বংস সাধনের জন্য পরাশক্তিসমূহের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত।

এ পর্যায়ে আধুনিক জীবন সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে রয়েছে এমন সব বিষয়াদি যেগুলোর ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। এসব বিষয়ে ইসলামী নীতিমালার আলোকেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে এমন সব বিষয়াদি যেগুলোর ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কোন ইসলামী দিকনির্দেশনা নেই। এগুলো ইসলামী মৌলিক আকিদাহ বিশ্বাস, জীবন দর্শন এবং বৃহত্তর মানব কল্যাণের নিরিখে গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয় বলে বিবেচিত হবে।

আমাদের সমাজে আধুনিকতার অন্ধ অনুকরণের পক্ষে যেমন কিছু লোক রয়েছে, তেমনি অকারণে এর বিরোধিতাকারী কিছু লোকও রয়েছে। অথচ সত্য ও কল্যাণের পথ হলো এ দু,য়ের মধ্যবর্তী। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে কোনটা আমাদের জন্যে কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণকর, এটা নির্বাচন করা ছাড়া অন্ধভাবে আধুনিকতার অনুকরণের পরিণতি হবে ধ্বংসাত্মক। এতে আধুনিকতার ইতিবাচক দিকগুলোর তুলনায় এর নেতিবাচক দিকগুলো বেশি করে আমাদের জীবন ও সমাজে অনুপ্রবেশ করে আমাদের জীবনকে ধ্বংস করে দেবে। তাই প্রথমোক্ত দলের লোকদের একটু সংযত হওয়া উচিত ।

শেষোক্ত দলের লোকদের জন্য আমাদের নসিহত হলো এই যে সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে মাঝে মাঝে নতুন কোন পন্থা বা বস্তুকে আপন করে গ্রহণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে মোটেই দোষণীয় নয়, যদি তা আমাদের মৌলিক আক্বীদা, বিশ্বাসের পরিপন্থী না হয়। যুদ্ধে খন্দক বা পরীখা খনন করে আত্মরক্ষা করা সে যুগে একটি নতুন রীতি ছিল। কিন্তু বৃহত্তর কল্যাণের কথা বিবেচনা করে মহানবী (স.) হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ) এর পরামর্শে তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। আর খেজুর উৎপাদনের ক্ষেত্রে মহানবী (স.) এর একটি পরামর্শ গ্রহণ করার ফলে উৎপাদন কম হলে তিনি বলেছিলেন যে এটা আমার নিজস্ব অভিমত ছিল। শরীয়তের কোন বিধান ছিল না। সুতরাং যে পদ্ধতিতে উৎপাদন বেশি হবে বলে তোমরা মনে কর সে পদ্ধতি তোমরা গ্রহণ করতে পার। "আনতুম আলামু বিউরি দুনয়াকুম" এসব সাংসারিক বিষয় তোমরাই ভালো বোঝ, এথেকে প্রমাণিত হলো যে, আক্বীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধ নিরপেক্ষ কল্যাণকর যে কোন প্রযুক্তি গ্রহণে ইসলামী কোন বাধা নেই।

সুতরাং ইসলামী জীবন ও মূল্যবোধকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে মুক্ত বুদ্ধি, উদার চেতনা ও বিজ্ঞানমনস্কতার মাধ্যমে আধুনিক কল্যাণকর প্রযুক্তি ও কার্যধারা প্রয়োগ করে মুসলিম উম্মাহকে উন্নতি, অগ্রগতি ও প্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়াই আজকের সময়ের ডাক। এ ডাকে সাড়া দেয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। এপথেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের হারানো গৌরব আমরা ফিরে পেতে পারি। অন্যথায় পশ্চাৎপদতা, ব্যর্থতা, গ্লানি নিয়েই আমাদেরকে কঠোর জীবন যাপন করতে হবে। সাথে সাথে নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে গড়ার জন্য আল্লাহ্ পাকের যে নির্দেশ তা লংঘন করার অপরাধে অপরাধীও হতে হবে।

[রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- ক্ষুধায় অধীর হয় নাই এইরূপ ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করা সুন্নাত এবং ক্ষুধায় অধীর হইয়া গিয়াছে এইরূপ ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করা ফরজ সে যে কেহই হউক না। শত্রু হস্তে বন্দী মুসলমানের মুক্তির ব্যবস্থা করাও ফরজ। (বুখারী)]

বস্তুত মুসলিম বিশ্বের দুর্ভাগ্য এই যে এখানে ইসলামের প্রকৃত অর্থ নিয়ে যেমন বিভ্রান্তি রয়েছে তেমনি বিভ্রান্তি রয়েছে আধুনিকতার যথার্থ স্বরূপ নিয়েও। পাশ্চাত্য ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা-দীক্ষা এবং ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানের অভাবে অনেক লোক মনে করে যে ইসলাম চৌদ্দ শত বছরের একটি পুরাতন জীবন দর্শন এবং এটা মূলত পারলৌকিক বিষয়াদি নিয়েই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আবর্তিত। তাই এরা ইসলাম ও আধুনিকতার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে বলে মনে করে। এদের এ ধারণাটি একেবারেই ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম চৌদ্দশত বছর নয় বরং চৌদ্দ হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন। কেননা ইসলামের আসল প্রবর্তক হলেন স্বয়ং আল্লাহ। হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে সব নবী-রাসুল ছিলেন এর প্রচারক। আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর হাতে এসে ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে ইসলাম এখানে এসে স্থবির হয়ে গেছে। বরং এর মানে হলো ইসলামের মৌল কাঠামোর পরিপূর্ণতা অর্জন। ইজতিহাদ ও গবেষণার মাধ্যমে ইসলামের বহিরাবরণের যুগোপযোগী সামঞ্জস্য বিধানের পথে কোন অন্তরায় আগেও ছিল না, বর্তমানেও নেই। এভাবে প্রতিনিয়ত জীবনী শক্তি আহরণের মাধ্যমে ইসলাম সদা চিরনতুন ও আধুনিক রূপ লাভ করতে থাকে। প্রাচীনত্ব ও আধুনিকত্বের সমন্বয় সাধনের এক চিরন্তন ব্যবস্থাই ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই পুরাতন বলে অনাধুনিক এ অপবাদ অন্য ধর্মের বেলায় প্রযোজ্য হলেও ইসলামের বেলায় এটা মোটেও প্রযোজ্য নয়। অন্যদিকে পরলোকে বিশ্বাস ইসলামী জীবন দর্শনের অন্যতম ভিত্তি হলেও শুধুমাত্র পারলৌকিক বিষয়াদি নিয়ে ইসলাম ব্যস্ত নয়। ইহলোক ও পরলোক উভয় জগতের মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করাই এর মূল লক্ষ্য। পবিত্র কোরআন ও হাদীস ইহলৌকিক বিষয়াদি নিয়ে এতো বেশি আলোচনা রয়েছে যে এর আলোকে সব যুগের সব সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে ইসলামই হচ্ছে সব যুগের উপযোগী একমাত্র আধুনিক ও কালজয়ী দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা।

অন্যদিক দিয়ে নজর করলে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম যেখানে আমাদেরকে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মজবুত ভিত্তি এবং কর্মের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী সমাধান যোগাতে সক্ষম, সেখানে ইসলাম ছেড়ে অন্য কোন মতবাদের অনুসারীরা পদে পদে শুধু হতাশা ও বিভ্রান্তির মায়াজালে আবদ্ধ। বিশ্বাস করার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শনকেই অনেকে আধুনিক বলে মনে করে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিজ্ঞান যেখানে প্রতিনিয়ত তার অবস্থান পরিবর্তন করতে অভ্যস্ত, সেখানে বিজ্ঞান-ভিত্তিক কোন দর্শনকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা হবে ? তদুপরি বিভিন্ন গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনায় একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে ইসলামের যাবতীয় দর্শনই বিজ্ঞানভিত্তিক। যদি কোথাও বিপরীত কিছু পরিলক্ষিত হয় তাহলে বুঝতে হবে যে বিজ্ঞান আজো সে স্তরে উন্নীত হতে পারেনি যেখানে পৌঁছালে আজকের এ আপাতগোচরীত বৈপরিত্য আর নজরে পড়বে না। কর্ম ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেকে আবার সমাজতন্ত্র ও পশ্চিমা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আধুনিক মনে করে থাকে। দীর্ঘদিন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বসবাস করে সেখান থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য হাজার হাজার মানুষের জীবন কোরবানী দেয়ার যে দৃশ্য সম্প্রতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তার পর এ ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণের জন্য আর কোন আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয় না। আর পশ্চিমা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেভাবে ধন বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে যার পরিণামে জগৎব্যাপী অশান্তির যে কালো ছায়া অতিদ্রুত নেমে আসছে তাতে এর পক্ষে প্রশংসাসূচক কোন মন্তব্য করার অবকাশ নেই। সুতরাং এদিক দিয়েও ইসলামকে অনাধুনিক বলার কোন জো নেই।

বস্তুত আধুনিকতার মূল কথা যদি হয় মুক্তি, শান্তি ও কল্যাণের জীবন-তাহলে ইসলাম ছাড়া অন্য জীবন ব্যবস্থাকে আধুনিক বলে গ্রহণ করার কোন পথ নেই। কেননা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা যে মানব জীবনে শান্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে না তা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক দিয়েই প্রমাণিত।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যদি কেউ হারাম উপায়ে অর্থ উপার্জন করে ধন সঞ্চয় করে এবং তার দ্বারা সাদাকাহ দেয়, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তবে সে ব্যক্তিকে সওয়াবের পরিবর্তে আজাব দেয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । (তিরমিযি)

ইসলাম ও আধুনিকতা নিয়ে অপর যে বিভ্রান্ত রয়েছে তা হলো অনেকে মনে করে যে আধুনিক জীবন মানেই অনৈসলামিক জীবন। এরাও ইসলাম ও আধুনিকতার মাঝে একটি দ্বন্দ্বে রয়েছে বলে মনে করে তবে ভিন্ন আঙ্গিকে। এ ধরনের বিভ্রান্তির মূল কারণ একদিকে যেমন জীবনের মূল ধারা থেকে এদের বিচ্ছিন্নতা, তেমনি অন্য দিক থেকে আধুনিক জীবনোপকরণের ইসলামসম্মত ব্যবহার ও প্রয়োগের অনুপস্থিতি। মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন বলে এরা আধুনিক জীবন ও আধুনিকতার প্রাণস্পন্দন বুঝতে সক্ষম নয় বিধায় ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণেও অপারগ। অন্য দিকে এ কথাও সত্য যে, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে আধুনিক জীবনোপকরণের ইসলামসম্মত ব্যবহার ও প্রয়োগের সযত্ন প্রয়াস অনুপস্থিত বলে এগুলোর ইসলামী চরিত্র নির্ণয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক।

মুসলিম বিশ্বে এবং বিশেষ করে আমাদের দেশে প্রচলিত অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থাই মূলত উভয় ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য দায়ী। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আচরিত জীবন ও লালিত আক্বিদা-বিশ্বাসের কোন প্রতিফলন শিক্ষা ব্যবস্থায় না থাকা যেমন অবৈজ্ঞানিক তেমনি যুগ চাহিদা ও জিঞ্গাসার ছোঁয়া বিবর্জিত যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটিও অবৈজ্ঞানিক। দু"টোই জীবন-বিচ্ছিন্ন, তাই অবশ্যই পরিবর্তনীয়। এ পরিবর্তন যত তাড়াতাড়ি আসে ততই আমাদের মঙ্গল।

মোহাম্মাদ জাফর
সাবেক রাষ্ট্রদূত ও মহাপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালক (গবেষণা), দি ইসলামিক রিসার্চ সোসাইটি বাংলাদেশ

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ মানুষ আল্লাহর নিকট বড় বড় জিনিস চেয়ে দোয়া করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা হারাম খায় ও হারাম বস্ত্র (বা হারাম অর্থের দ্বারা কেনা বস্ত্র) পরিধান করে থাকে। এই ধরণের লোকের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে ? (মুসলিম ও তিরমিযি)]

Ghazzali and Purification of Heart

Abu Hamid Al-Gazzali was born in AD 1058 and died in the year 1111 AD. During this relatively short life span of 53 years he authored about 400 books.

The life and works of Abu Hamid Al-Gazzali is a vast subject. His greatest work is considered to be his " Ihya Ulum al-Din '(Revival of the Religious Sciences). The title of the book sums up his achievements. For he revitalised Islam at a time when its inner reality (The Tariqa of religion) was under threat from over-concern with outer form (sharia). As he said, "those who learned about, for example, the laws of divorce, can tell you nothing about the simpler aspects of spiritual life, such as the meaning of sincerity towards God or trust in Him".

Al-Gazzali is a towering figure in Islamic scholasticism and mysticism. The dominant view of Al-Gazzali is quite succinctly summarised by Professor Anne Marie Schimmel, the long time professor of Indo-Muslim culture at Harvard University. I quote,

"All that Gazzali teaches… is only to help man lead a life in accordance with sacred law, not clinging exclusively to its letter but by understanding of its deeper meaning, by sanctification of the whole life, so that he is ready for the meeting with his Lord at any moment….. this teaching – a marriage between mysticism and law has made Gazzali the most influential theologian of medieval Islam" (Inner Dimension of Islamic Worship)

The sanctification of life in preparation of meeting one's Lord – underlines Gazzali's whole life. The purification of the heart is the purpose of life to meet Almighty Allah. The Holy Quran in its Ayat in Sura Shuara says "The Day whereupon neither wealth nor sons will avail, But only he that brings to Allah a sound heart." Only to them will belong "The Garden of Bliss." Inheritance of the Garden of Bliss is for those who come with a heart pure and whole, but equally important is to meticulously follow the footsteps of the prophet upon him be peace. If you love God, follow me, and God will love you and forgive yours sins." (Surah Al-Imran 3:31)

Gazzali questioned about the religious conformism what we may call in modern times "indoctrination". He records that inherited belief "lost their grip on me, for I saw that Christian youths always grew up to be Christians, Jewish youths to be Jews and Muslim youths to be Muslims." I heard too, that tradition (Hadith) related to the prophet of God according to which he said 'Everyone who is born with a sound nature (fitra), it is his parents who make him Jew, Christian or a Magian (Zoroastrian)'. Therefore, it became a life's search for Gazzali to find out the nature of "fitra", the sound nature of man.

Al-Gazzali left his teaching post at Nizamiya Academy on the reflection, That "I saw that it was not directed to God but rather instigated and motivated by the quest for fame and widespread prestige".

What is the nature of the way Gazzali speaks of. In his words, "purification consists above all of cleansing the heart of everything which is not God, the Almighty". This begins not with the state of sacralisation which opens prayer, but by fusion of the heart with God's name and is completed by the total annihilation of the self in God".

Gazzali considers this as a first step in the mystical journey. One begins to receive inspirations and "visions" and through "vigils they even see angels and the spirit of the prophets. They hear their voices and have the benefit of their counselling. From these visions of images and symbols they ascend further to degrees of spirituality which cannot be described. Nobody can attempt to express these states of the soul without failing miserably".

Gazzali warns that anyone who experienced such spiritual ecstasy and achieved nearness to God should not speak about it. Whatever has happened has happened.
"The aim of their (sufis) knowledge is to lop off the obstacles present in the soul and to rid oneself of its reprehensible habits and vicious qualities in order to attain thereby a heart empty of all save God and adorned with the constant remembrance of God".

He studied and learnt about all Sufi theories: "It became clear to me that their distinctive characteristic that can be attained not fully by study, but rather by fruitional experience (experience of pleasure) and the state of 'ecstasy' and the exchange of qualities."
"In the course of these periods of solitude things impossible to enumerate or detail in depth were disclosed to me. This much I shall mention, that profit may be derived from it: I know with certainty that the sufis are those who uniquely follow the way to God Most High, their mode of life is best of all, their way the most direct of ways, and their ethic the purest. Indeed were one to combine the insights of intellectuals, the wisdom of the wise and the love of scholars versed in the mysteries of revelation in order to change a single item of sufi conduct and to replace it with something better, no way to do so would be found. For all their motions and quiescence, exterior and interior are burned from the light of the niche of prophecy. And beyond the light of prophecy there is no light on earth from which illumination can be obtained."

The "key" to the purification of "heart" is analogous to the beginnings of prayer. (Allahu Akbar – Tahrim), is the utter absorption of the heart in remembrance of God. Its end is being completely lost in God."

The following poem originally written in Arabic was found under his pillow after his death:

"Say unto brethren when they see me dead,
And weep for me, lamenting me in sadness:
'Think ye I am this corpse ye are to bury?
I swear to God, this dead one is not I.
I in the Spirit am, and this my body
My dwelling was, my garment for a time...
I praise God who hath set me free, and made
For me a dwelling in the heavenly heights,
Ere now I was a dead man in your midst,
But I have come to life, and doffed my shroud."

Syed Rezaul Karim
Member, Executive Committe,
Gulshan Central Masjid & Iddgah Society

স্রষ্টাপ্রেম ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা

ইসলামে মানুষের হৃদয়বৃত্তির ব্যাপক একটি ভুবনের কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্ম নেই যেখানে ভালোবাসাকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি বা খাটো করে দেখা হয়েছে। ভালোবাসা কোনো স্বীকৃতি বা আদায়ের বিষয় নয়, বরং তা এমন এক অনুভূতি যার প্রভাবমুক্ত থাকা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। ভালোবাসা এমন একটি বিষয় যা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করলেও অন্যের মন পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়; আবার যাকে কোনোভাবে গোপন রাখাও সম্ভব নয়। ফুলের সুবাসের মত, সূর্যের আলোর মত তা প্রকাশ পাবেই। 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষ স্বভাবতই নিজেকে ভালোবাসে। এ কারণে সে তার স্রষ্টাকেও ভালোবাসে। মূলত ভালোবাসা দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত, একটি হলো স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির ভালোবাসা আর অপরটি হলো সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির ভালোবাসা। নিজের প্রতি ভালোবাসার মূলসূত্র ধরেই মানুষ তার বাবা-মা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী এমনকি উপকারীকেও ভালোবাসে। আর এ ভালোবাসা পেতেই সে অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রয়াসে লিপ্ত হয়। নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং আরাম-আয়েশ ভোগ করতে একের পর এক নিত্যনতুন পন্থা আবিষ্কার করে চলেছে। মানবজাতির স্রষ্টা নিজেও তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসার পাত্রের জন্য পৃথিবীকে সুশোভিত করে সাজিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তারা আল্লাহকে ভালোবাসে।' (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত-৫৪)

মানুষকে সৃষ্টিগত দাবি অনুসারেই সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসতে হবে এবং তিনি যে পথ অনুসরণ করতে বলেছেন তা অনুসরণ করতে হবে। স্রষ্টাপ্রেম হবে সব ভালোবাসার ঊর্ধ্বে এবং সে পথ হবে সব পথের উর্ধ্বে। তাহলেই হবে সৃষ্টির সার্থকতা এবং স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সুসম্পর্ক। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা স্রষ্টা প্রদত্ত একটি স্বাভাবিক ও অনিবার্য বিষয়; তাই এটি মানব মন ও দৈনন্দিন জীবনে ঈমানের দাবি। প্রাকৃতিক পরিবেশের অপরূপ সৌন্দর্য তথা গাছ-পালা, ফুল-পাখি, নদী-সমুদ্র, আকাশ এবং নানা মনোহারিণী বিষয়কে না ভালোবাসলে নিজের সন্তানকেও ভালোবাসা যায় না। তেমনি সৃড়িৎসৎকে না ভালোবাসলে স্রষ্টাকেও ভালোবাসা যায় না। ফলশ্রুতিতে কোনো রকম প্রত্যাশা ছাড়াই মানুষ প্রকৃতিপ্রেমে নিমগ্ন হয়, অনেকে আপজনহীন হয়েও একদল অনাত্মীয়ের ভিড়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। কেউ অসহায় কোনো মানুষ, শিশু বা জীব-জন্তুকেও নিঃস্বার্থে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং তাকে কেন্দ্র করে নিজের জীবন চলার পথ বদলে ফেলে। মানবপ্রেম সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, 'আর তিনি (আল্লাহ) তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আর-রূম, আয়াত-২১)

জাগতিক সব কাজ-কর্ম ও নেক আমল আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সুদৃঢ় করার উপলক্ষ মাত্র। সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভই ধর্মপ্রাণ মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদার সম্বল। স্রষ্টাপ্রেম অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে তাঁর প্রতি গভীর ধ্যানমগ্নতা, আত্মসমর্পণ ও মনোনিবেশ করা। সমগ্র সৃষ্টি তার স্রষ্টাকে ভালোবাসে, আর স্রষ্টা নিজে তাঁর সর্বোত্তম সৃষ্টি ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) কে ভালোবাসেন। মানবীয় গুণাবলির বিকাশ সাধন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরপারে পরিত্রাণ লাভ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ বাস্তবায়নে ও তাঁর ভালোবাসা অন্তরে স্থান দেয়া ছাড়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে দিকনির্দেশনা প্রদান করে ঘোষিত হয়েছে, 'বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩১)

["রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন - জামাতের নামাজ একাকী নামাজ পড়ার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদা রাখে"। (বুখারী)]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব শ্রেণীতে ভালোবাসার শ্রেষ্ঠতম পাত্র হচ্ছেন বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত নবীকুল শিরোমণি হজরত মুহাম্মাদ (সাঃ)। কারণ এ উম্মতের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও অবদান সবচেয়ে বেশি। নবী করিম (সা.) তাঁর উম্মতকে দুটি কারণে ভালোবাসবেন। ১.যারা তাঁর আনীত বিধি-বিধান তথা পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালিত করবে। ২. তাঁকে ভালোবেসে যারা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং তাঁর ভালোবাসার পাত্র হয়েছিলেন। ইসলামী শরিয়তে নবী করিম (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা একটি অপরিহার্য কর্তব্য, যার অবর্তমানে ঈমানই পরিশুদ্ধ হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বাণী প্রদান করেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমগ্র বিশ্ববাসী অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় না হব।' (বুখারী ও মুসলিম) তিনি আরো বলেছেন, 'তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আবার পরস্পরকে ভালোবাসতে না পারা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ের খবর দেব না যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে সক্ষম হবে? (তা হলো) তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে।' (মুসলিম)

মানুষ যে উৎসের প্রেক্ষিতে একে অপরকে ভালোবাসে, এ সম্পর্কে গভীরভাবে বিবেচনা করলে নির্দ্বিধায় বলতে বাধ্য হবে– আমার প্রেম-ভালোবাসা, জীবন-মৃত্যু, আমার সর্বস্ব সেই মহান সত্তার জন্য নিবেদিত, যিনি আমার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা; যেমনভাবে বলেছিলেন মুসলিম জাতির পিতা হজরত ইবরাহিম (আ.)। পবিত্র কোরআনের ভাষায়, 'নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও মরণ- সবকিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য- যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক।' (সূরা আল-আনআম, আয়াত-১৬২) তাই মুমিন মুসলমান হতে হলে অবশ্যই প্রত্যেক মানুষকে তার জীবন, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সবকিছুর চেয়ে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সর্বাধিক ভালোবাসতে হবে। তাঁর হুকুম-আহকাম বা বিধি-বিধানগুলো শুধু জাহান্নামের ভয়েই নয়, বরং স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসার জন্য পালন করতে হবে।

সৃষ্টিকর্তা মানুষের স্বভাব-চরিত্রে যে প্রেমবোধ দিয়েছেন তা শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা সর্বব্যাপী। তাই মানুষ আপনজনের গণ্ডি ছাড়িয়ে তার ভালোবাসা আশপাশের সুবিস্তৃত পরিবেশমণ্ডলীতে ছড়িয়ে দেয়। ফলে দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা এবং হৃদয়ের টান একজন মানুষের পক্ষ থেকে অন্য মানুষ অবশ্যই পেতে পারে। ভালোবাসার পাত্র হতে পারেন সন্তান-সন্ততির জন্য তার পিতা-মাতা, মা-বাবার জন্য তার ছেলে-মেয়ে, ভাইয়ের জন্য বোন, বোনের জন্য ভাই এবং অপরাপর আত্মীয়-অনাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী যে কোনো আপনজন। একজন মানবের ভালোবাসা একজন মানবীও পেতে পারেন। তবে সে ভালোবাসা হতে হবে বৈধ ও অনুমোদিত। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা কেবল শরিয়তের অনুমোদনের গণ্ডিতেই আবদ্ধ নয়; বরং তা বহুবিধ পুণ্যময় কাজ। ভালোবাসা পোষণ ও প্রকাশের বৈধ কোনো সম্পর্ক ছাড়া ইসলামে একজন মানব-মানবীর মধ্যে হৃদয়ের কোনো টান থাকা এবং প্রেমকে আরো গভীর করার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে একজনের প্রতি অন্যের ভালোবাসা হতে হবে 'ফিল্লাহ' বা আল্লাহর ওয়াস্তে। অর্থাৎ আমি তাকে ভালোবাসব এজন্য যে, তার প্রতি আমার ভালোবাসা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত। কেননা যারা মুমিন তারা আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।

সুতরাং ইহকাল ও পরকালে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির জন্য সাহাবায়ে কিরামের ন্যায় আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে এবং রাসূলের প্রদর্শিত ধর্মের পথে চলতে হবে। যে ব্যক্তি স্রষ্টাপ্রেমের দাবিদার তার কথায়, কাজে, চিন্তায়, চর্চায় এক কথায় জীবনের সর্বস্তরে বিশ্বনবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ সম্ভবপর হলেই সফলকাম হওয়া যাবে।

[দু'টি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (১) যে চোখ গভীর রাতে আল্লাহর ভয়ে কাঁদে । (২) যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারাদারীতে রাত কাটায় । (কানযুল উম্মাল)]

প্রাত্যহিক জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলে করিম (সা.)-এর আনীত জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন আর নিষেধকৃত কার্যাবলী বর্জনই হোক মুমিনের একমাত্র ব্রত।

প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ একাকী জীবন ধারণ করতে পারে না। পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে তার বসবাস। সে কারো থেকে বিচ্ছিন্ন নিছক কোনো প্রাণী নয়। কোনো কারণে সে পরিবার-পরিজন থেকে সাময়িক বিচ্ছিন্ন হলেও প্রতিবেশী থেকে সে কখনো বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। যেখানে যায় সেখানেই তার কোনো না কোনো প্রতিবেশী থাকে। পরিবার থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন হলে প্রতিবেশী তখন তার পরিবারের অভাব পূরণ করে। বিপদে-আপদে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। তাই মানুষের জীবনে প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব অপরিসীম। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একত্রে মিলেমিশে বসবাস করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে। এর সুবাদে গড়ে উঠেছে প্রতিবেশী ও প্রতিবেশীসুলভ মানসিকতা ও আচার-আচরণ। প্রতিবেশী কারা? কতোদূর এর সীমা? এমন এক প্রশ্নের জবাবে হজরত হাসান (রা.) বলেছেন, 'নিজের ঘর থেকে সামনে চল্লিশ ঘর, পেছনে চল্লিশ ঘর, ডানে চল্লিশ ঘর এবং বামে চল্লিশ ঘরের অধিবাসীরা হচ্ছে প্রতিবেশী।' আর এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পড়শী, নিকটবর্তী, পাশাপাশি হওয়া, পার্শ্ববর্তী ইত্যাদি। পবিত্র কোরআনের ভাষ্য মতে তিন শ্রেণীর লোক প্রতিবেশী ১. যারা আত্মীয় এবং প্রতিবেশী। ২. যারা শুধু প্রতিবেশী। ৩. সহচর, সহকর্মী এবং অধীনস্থ লোক। এরা সবাই প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত।

জীবনের তাগিদে সমাজবদ্ধ মানুষকে অন্যান্য মানুষের সাহায্য নিতে হয়। মানুষ তার অসংখ্য প্রয়োজনের জন্য অসংখ্য মানুষের মুখাপেক্ষী। যতক্ষণ সমাজের লোকদের সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে না উঠবে, ততক্ষণ সে স্বাভাবিকভাবে জীবন ধারণ করতে পারবে না। তাই মানুষের পরস্পর প্রতিবেশীর সাথে তার ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করা উচিত। আর এ সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য পরস্পর ঐক্যের বিশ্বাস স্থাপন করা এবং একে অন্যের অধিকারের প্রতি যত্নশীল হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পবিত্র কোরআনে প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণের তাগিদ দিয়ে বলা হয়েছে, 'আর আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। 'আর তোমরা পিতামাতা, নিকট আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকীন, নিকটতম প্রতিবেশী, দূরবর্তী প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথিক এবং যারা তোমাদের অধিকারে এসেছে তাদের সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক-গর্বিতজনকে পছন্দ করেন না।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬)

প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ও সদাচরণের বিষয়ে ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। সমাজ জীবনে প্রতিবেশী সবচেয়ে কাছের লোক। সুখে-দুঃখে সবার আগে তাকে পাওয়া যায়, এজন্য তার হকও বেশি। প্রকৃতপক্ষে মানুষ চিন্তা করে না তার প্রতিবেশী ব্যক্তিটি সে আত্মীয় বা অনাত্মীয় যেই হোক না কেন, সে তার নিকটতম ব্যক্তি। সার্বক্ষণিক তার সান্নিধ্য আশা করা যায়। বিপদ-আপদ, সুখে-দুঃখে তার সান্নিধ্য পাওয়া যেতে পারে। তদ্রূপ এক প্রতিবেশীও অন্যের কাছ থেকে অনুরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করে। হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'জিব্রাইল (আ.) আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে ক্রমাগতভাবে এমনি তাগিদ করতে লাগলেন, আমার ধারণা হচ্ছিল হয়তো তাকে সম্পদের ওয়ারিশ বানিয়ে দেয়া হবে।' (বুখারী ও মুসলিম) অনুরূপ একাধিক হাদীস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এবং হযরত জাবির (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যেখানে আশঙ্কা করছিলেন হয়তো প্রতিবেশীকে সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেশীর কত অধিকার রয়েছে।

["কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত লোক হবে ন্যায়পরায়ণ শাসক। পক্ষান্তরে আল্লাহর নিকট কিয়ামতের দিন সবচেয়ে ঘৃণিত ও কঠিন শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি হবে জালিম শাসক"। (তিরমিজি)]

সমাজে প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের অধিকার রয়েছে। বর্তমান সমাজে মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কারণে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা যায়। তাই প্রত্যেকের সাথে তার প্রাপ্য অধিকার অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা, মেহমানের যত্ন নেয়া, বিবদমান দুই ব্যক্তির মাঝে পারস্পরিক সন্ধি-সমঝোতা সৃষ্টি করে দেয়া–এগুলো ধর্মপ্রাণ মুসলমানের মানবিক কর্তব্য। মানুষ যখন তার এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হবে। ফলে তাদের সামাজিক জীবন সহজ ও শান্তিময় হতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কোনো না কোনো কারণে বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের প্রায়ই বাক-বিতণ্ডা, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, প্রতিযোগিতা- প্রতিহিংসা লেগেই থাকে। এক পর্যায়ে এটি ঘৃণ্য বর্বরতায় রূপ নেয়। সামাজিক সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে বুঝে উঠতে মামলা-মোকদ্দমার আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। প্রতিবেশীকে জব্দ করতে দৃঢ়চিত্তে অঙ্গীকার করে। অথচ একজন কর্মজীবীর জন্য সৌভাগ্য হচ্ছে ভালো মনিব পাওয়া। একজন চাকরিজীবীর জন্য সৌভাগ্য হচ্ছে ভালো নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা পাওয়া। আর একজন বাড়িওয়ালার জন্য সৌভাগ্য হচ্ছে ভালো প্রতিবেশী পাওয়া। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'একজন মুসলিমের জন্য খোলামেলা বাড়ি, প্রশস্ত বাসভবন, সৎ প্রতিবেশী এবং রুচিসম্মত বাহন সৌভাগ্যস্বরূপ।'

যে আত্মীয় বা বন্ধুটি মানুষের অত্যন্ত প্রিয়, একান্ত কাছের এবং তাদের পারিবারিক সম্পর্কও অত্যন্ত মধুর; যখনই সে বন্ধু বা আত্মীয়টি তার প্রতিবেশী হল, তখনই তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। প্রতিবেশীর মঙ্গল, সামাজিক অবস্থান, স্থাবর ও অস্থাবর ঐশ্বর্য, পদমর্যাদা সবকিছুই হয় তার বা নিজের পারিবারিক সদস্যদের মনোকষ্টের কারণ; যা এক পর্যায়ে প্রতিহিংসায় রূপ নেয়। বিশেষ করে মহিলা ও শিশু-কিশোরদের দ্বারাও প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, 'যার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত যাপন করে সে আমার ওপর ঈমান আনেনি।' (মুসনাদে দাইলামি)

পাড়া-প্রতিবেশীর প্রয়োজন মেটানোর অগ্রাধিকার ইসলামে রয়েছে। প্রতিবেশী অভাবগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত ও দুর্যোগে পতিত হলে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য করে তার অভাব-অনটন মোচন করে দেবে, সে ক্ষুধার্ত হলে প্রয়োজনে তাকে খাদ্য দান করবে–ইসলাম এই শিক্ষা দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি পেট ভরে আহার করে অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় অনাহারে থাকে সে ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার নয়।' (বায়হাকি) প্রতিবেশীর অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে মহানবী (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে বলেছেন, 'প্রতিবেশীর অধিকার কি তা তোমরা জান? প্রতিবেশীর অধিকার হচ্ছে তোমার কাছে সাহায্য চাইলে সাহায্য করবে, ধার চাইলে ধার দিবে, অভাবগ্রস্ত হলে অভাব মোচন করবে, অসুস্থ হলে তত্ত্বাবধান করবে, প্রাণত্যাগ করলে তার জানাজায় যাবে, আনন্দে অভিবাদন এবং দুঃখে সমবেদনা জানাবে। তোমার গৃহের দেওয়াল উঁচু করে তার বাতাস বন্ধ করবে না। ফল ক্রয় করলে তাকে পাঠিয়ে দাও। পাঠাতে না পারলে গোপন রাখো এবং নিজের সন্তানদের ফল হাতে বের হতে দিও না, যেনো প্রতিবেশীর সন্তান দুঃখ না পায়। নিজের রান্নাঘরের ধোঁয়া দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিও না। কিন্তু তাকে যদি খাদ্য দাও তা হলে অসুবিধা নেই।'

প্রতিবেশীর মধ্যে পরস্পরে দেনা-পাওনার সম্পর্ক রয়েছে। ভারসাম্যপূর্ণ দেনা-পাওনার মাধ্যমে গড়ে উঠে সৎ প্রতিবেশীমূলক সুসম্পর্ক। প্রতিবেশীদের মধ্যে উপঢৌকন পাঠানোর ক্ষেত্রে নিকটজনকে অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, 'একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললাম, 'হে রাসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে, তন্মধ্যে আমি কার কাছে উপঢৌকন পাঠাব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'যার দরজা তোমার অধিকতর নিকটে তার কাছে।'

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)]

প্রতিবেশীর প্রতি তার আচরণ দ্বারা একজন মুসলমানের ঈমান কত বেশি মজবুত তা বোঝা যায়। কেননা একজন খাঁটি মুমিন বান্দা কখনো তার প্রতিবেশীর অনিষ্টের বা অশান্তির কারণ হতে পারে না। একজন সত্যিকার মানুষ নিজের জন্য যা ভালো মনে করে, অন্যের জন্যও তা ভালো মনে করে। নিজের জন্য যা খারাপ মনে করে অন্যের জন্যও তা খারাপ মনে করে। আর এ বিষয়টি পরীক্ষার যথাযথ স্থান হচ্ছে প্রতিবেশী। কে ভালো, কে মন্দ, কে ঈমানদার, প্রতিবেশীর চেয়ে আর কেউ নির্ভুলভাবে তা বলতে পারে না। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! সেই ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম! সেই ব্যক্তি ঈমানদার নয়, আল্লাহর কস্‌ম! সেই ব্যক্তি ঈমানদার নয়। বলা হলো, কোন ব্যক্তি হে রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, 'যার প্রতিবেশী তার কাছ থেকে নিরাপদ বোধ করে না।' (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলাম মুসলমানদের প্রতিবেশীর সঙ্গে সামাজিক কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছে। মুমিনদের যে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা হলো প্রতিবেশীর কাউকে মন্দ নামে না ডাকা, কারো প্রতি খারাপ ধারণা না করা, কাউকে বিদ্রূপ না করা, কারো অগোচরে তার নিন্দা না করা। এসব আচরণ দ্বারা ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয় এবং অপর মুসলমান ভাইয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। তাই ইসলামে এগুলো হারাম। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। মুমিনগণ কেউ যেন কাউকে উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী যেন অপর নারীকে উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অন্যকে মন্দ নামে ডেক না।' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত:১০-১১)

সমাজে পরনিন্দার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বিশেষ উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে?' বাস্তবে মানুষ হয়ে মানুষের মাংস ভক্ষণ করা যেমন দুরূহ কাজ, তদ্রূপ এক মুসলমান ভাই অপর ভাইয়ের নিন্দা করাও কঠিন অপরাধ। প্রতিবেশী মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। পবিত্র কোরআনে মুমিনদের গুণস্বরূপ বলা হয়েছে, 'তারা মুসলমানদের প্রতি কোমল হবে।' (সূরা মায়েদা, আয়াত: ৫৪)

বাস্তবে কোমল হৃদয়ের না হলে প্রতিবেশীর পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় না। আর ভালোবাসা সৃষ্টি না হলে সমাজের বন্ধনও ঠিক থাকে না। তাই পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি কোমল হৃদয় হওয়া উচিত। মানব জীবনকে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধময় করার জন্য সৎ ও ভালো প্রতিবেশীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অসৎ ও মন্দ প্রতিবেশী দ্বারা যাতে মানুষের কল্যাণ বিঘ্নিত না হয়, সে জন্য ইসলাম সৎ প্রতিবেশী সৃষ্টির উপায়-উপকরণের শিক্ষা দিয়েছে। যার প্রতিবেশী খারাপ সে জানে সৎ প্রতিবেশীর প্রয়োজনীয়তা কত গুরুত্বপূর্ণ। ভালো প্রতিবেশীর সাহচর্য জীবনকে করে মধুময়। মন্দ প্রতিবেশী নরকতুল্য। সে মানুষকে বিষিয়ে তোলে এবং পদে পদে অশান্তি সৃষ্টি করে। হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'সে ব্যক্তি কখনো বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয়।' (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ)

একজন মানুষ ভালো কি মন্দ তা তার সঙ্গী-সাথী, বন্ধু-বান্ধন ও পাড়া-প্রতিবেশীরাই ভালো জানেন। তারা যাকে ভালো বলবে সে খারাপ হতে পারে না। আর তারা যাকে খারাপ বলবে সাধারণত সে ভালো হয় না। কারণ তারাই তাকে কাছ থেকে দেখে। তাই বিয়ে-শাদী বা অন্য কোনো কারণে কারো সম্পর্কে জানতে হলে তার সঙ্গী-সাথী ও প্রতিবেশীকেই জিজ্ঞেস করা হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)

[রাসূল (সাঃ) বলেছেন, মিরাজ রজনীতে আমি জান্নাতের দরজায় এ কথাটি লিখে দিয়েছি "দানের সওয়াব দশ গুণ আর কর্জ প্রদানের সওয়াব আঠার গুণ"। (ইবনে মাজাহ বায়হাকী)]

থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে সেই সাথীই উত্তম যে তার নিজ সাথীদের কাছে উত্তম এবং আল্লাহর কাছে সেই প্রতিবেশীই উত্তম যে তার নিজ প্রতিবেশীর কাছে উত্তম।'

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া আল্লাহ তাআলার কাছে অত্যন্ত গর্হিত ও মন্দ কাজ। এ মন্দ কাজ এত বেশি ক্ষতিকর যে, সে ভালো কাজের ওপর জয়ী হয়ে যায়। একদা লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে নিবেদন পেশ করলো, 'অমুক মহিলা দিনে রোজা রাখে, রাতভর নামাজ পড়ে; কিন্তু সে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। নবী করিম (সা.) বললেন, 'সে দোজখে যাবে।' অর্থাৎ প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়ার গুনাহর পরিমাণ বা ওজন দিন-রাত ইবাদত করার সওয়াবের চেয়ে বেশি বা ভারী। প্রতিবেশীকে কষ্ট না দিলেই তার প্রতি দায়িত্ব পালন শেষ হয়ে যায় না। তাদের সাথে সদ্ব্যবহার, বিপদে-আপদে সাহায্য এবং উপকার করাও অবশ্য কর্তব্য। হাদীস শরিফে বর্ণিত আছে, 'দরিদ্র প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন ধনী প্রতিবেশীর সম্পর্কে আল্লাহর কাছে এ বলে অভিযোগ করবে যে, 'হে আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমার কল্যাণ করেনি কেন এবং আমাকে তার ঘরে যেতে দেয়নি কেন?'

পবিত্র কোরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সব প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মানুষের ঈমানী ও নৈতিক দায়িত্ব। প্রতিবেশী যে কোনো ধর্মের বা বর্ণের এবং যে কোনো আদর্শের অনুসারীই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা ইসলামের সামাজিক বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত। সকল মানুষের প্রতি উদার, সহনশীল মনোভাব পোষণ ও মানবীয় আচরণ প্রদর্শন ইসলামে অবশ্যপালনীয়। মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সকল প্রতিবেশীর সাথে ভ্রাতৃত্বসূলভ আচরণ একজন মুসলিমের ঈমানের অঙ্গ। প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসার বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সব প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও আখিরাতের উপর ঈমান এনেছে, তাকে বলে দাও সে যেন তার প্রতিবেশীর সম্মান করে।'

সমাজ জীবনে অনেক শক্তিধর প্রতিবেশীকে দেখা যায়, দুর্বল বা সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রতিবেশীকে তাড়িয়ে তার বাড়ি-ঘর দখল করার জন্য তার ওপর নানা ধরনের নির্যাতন চালানো হয়; তার ঘরের সামনে ময়লা আবর্জনা ফেলে রাখা হয়, ঘর থেকে বের হওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়, শিশু-কিশোরদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়া হয়, অহেতুক ও মিথ্যা মামলা দায়ের করে আর্থিকভাবে দুর্বল করে দেয়া হয়, মিথ্যা অপবাদ রটানো হয়। ইসলাম এ ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপকে কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এগুলোকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করে বলেছেন, 'যে প্রতিবেশী তার কোনো প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে বা তার সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে, যার ফলে সে ব্যক্তি গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়।'

সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রতিবেশী আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু হতে পারে। হতে পারে বিপদে পরামর্শদাতা, সুখের সঙ্গী। জীবন সায়াহ্নে ছেলেমেয়ের অনুপস্থিতিতে কাছে পেতে পারি প্রতিবেশীকে। আমরা তৈরি করতে পারি মধুর সম্পর্ক। তাই সামান্য ভুল-ত্রুটিকে উপেক্ষা করে আমাদেরকে সংযত হতে হবে, একে-অপরের প্রতি ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধাবোধ দেখাতে হবে। প্রতিবেশীর হক আদায়ের বিষয়ে ইসলাম যে গুরুত্ব আরোপ করেছে, তা যদি মানব জীবনে যথাযথভাবে অনুসরণ করা যায় তা হলে কোনো সমাজে অশান্তি ও দুঃখ থাকবে না। সব ধরনের ক্লেশ ও পরস্পরের হানাহানি বিদূরিত হবে আর সমাজে প্রতিবেশীর যথাযথ অধিকারও সংরক্ষিত হবে।

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফরজ রোজা অনাদায় রেখে মারা গেল, তার উত্তরাধিকারী বা অভিভাবক তার অনাদায় রোজার কাযা আদায় করবে। (বুখারী ও মুসলিম)]

যে বা যারা পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গরিব-দুঃখীজন ও অন্যান্য সবাইকে মানবতার দৃষ্টিতে যথারীতি ভালোবাসে; সে মূলত আল্লাহর হুকুমেরই তাবেদারি করে এবং সব মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথ পালন করা বস্তুত স্রষ্টাপ্রেমের নামান্তর। তবে প্রেম-ভালোবাসা প্রকাশের প্রতিযোগিতায় জঘন্য ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হওয়ার চেয়ে মনকে প্রকৃত অর্থে মানবপ্রেমের উপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা একান্ত কর্তব্য হওয়া উচিত। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে সঠিকভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রাণাধিক ভালোবাসার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক একাডেমী ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ অ্যান্ড দাওয়াহ, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ধানমণ্ডি, ঢাকা। পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব হযরত মুহাম্মদ (সা.)

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ করল এবং হজ্জ করা কালে কোন ধরণের অশালীন কথা ও কাজ এবং কোন গুনাহর কাজে লিপ্ত হয়নি, সে নবজাতক শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। (বুখারী ও মুসলিম)]

ভোগ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ইসলামী অনুশাসন

আমরা জীবন ধারণের জন্য আহার গ্রহণ করি। এই খাদ্য-পানীয় আমাদের দেহে পুষ্টি জোগায়, রোগ প্রতিরোধ করে এবং সর্বোপরি আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। মহান আল্লাহ্ তাই আল-কুরআনে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

" ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদেরকে আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা হতে আহার কর এবং আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করে থাকো" (আল-কুরআন, ২:১৭২)।

উপরোক্ত আয়াতে "তাইয়্যেবাত" (পবিত্র বস্তু) বলতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, হালাল ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য-পানীয়কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, কিছু লোকের দুর্নীতির কারণে এ খাদ্যই আজ বিষে পরিণত হয়েছে। খাদ্যে ভেজাল মেশানোর ফলে আজ নানারকম রোগ মহামারীর মত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি বৈকল্য, চর্ম রোগ ইত্যাদি ব্যাধি মানুষের দেহে বাসা বেঁধে অকালে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এ দেশে রেল ও বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারে ব্যবহৃত তেল কোথাও কোথাও সয়াবিন হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। জীবন-রক্ষাকারী ওষুধে ভেজাল মেশানো হচ্ছে। ফরমালিনযুক্ত মাছ-গোশত খেয়ে অন্ত্রের পীড়া হচ্ছে। ট্যালকম পাউডার দিয়ে সর্দি-কাশির লজেন্স তৈরি হচ্ছে। মরা মুরগি দেদারছে হোটেলে খাওয়ানো হচ্ছে। বিষাক্ত রং মিশিয়ে পানীয় ও মিষ্টি বানানো হচ্ছে। বিষাক্ত কেমিক্যাল দিয়ে ফলের রং আনা হচ্ছে। গুঁড়া দুধ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কসমেটিক ব্যবহার করা হচ্ছে। বাসি খাবার, পঁচা ডিম দিয়ে নানান ফাস্টফুড পরিবেশন করা হচ্ছে। ইউরিয়া মেশানো মুড়ি বেচা হচ্ছে। ভেজালের কবলে পড়ে শিশু, গর্ভবতী মাসহ সকল বয়সী মানুষ আজ জীবন যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে।

আগে আমরা শুনতাম যে দুধের সাথে পানি মেশানো হতো। আর আজ কত অকল্পনীয় কৌশলে যে ভেজাল মেশানো হচ্ছে তা সাধারণ ক্রেতাদেও বোঝার কোন উপায় নেই। মাঝে মধ্যে ভেজাল কারখানা, ভেজাল মেশানোর কৌশল ধরা পড়ছে বটে; কিন্তু এত বিরাট জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুখোশধারী ব্যবসায়ীদের পুরোপুরি চিহ্নিত করা বড়ই কঠিন। একটি মাত্র পথ খোলা আছে, তা হচ্ছে মানুষের মন-মানসিকতা পরিবর্তন। আপাত লাভ যে কত বড় সর্বনাশ ডেকে আনছে তা বোঝানো যাবে না। ভেজালকারী তার একটি পণ্যে প্রতারণা করে তো আত্মশ্লাঘা বোধ করছে। কিন্তু সে আর দশটি পণ্য ভোগ করার জন্য যখন খরিদ করছে তখন তো ঠকছে।

সবচেয়ে বড় কথা, এ জীবনের দিনগুলো ফুরিয়ে যাওয়ার পর যখন আখেরাতে আল্লাহ্'র সম্মুখীন হবে তখন তার কী উপায় হবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

" তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না" (আল-কুরআন, ২:৪২)।

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ রমজান মাসে উমরা করা আমার সাথে হজ্ব করার সমপরিমান সওয়াব। (বুখারী ও মুসলিম)]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা ও জালিয়াতি করবে সে আমাদের সমাজভুক্ত নয়" (সহিহ মুসলিমে সঙ্কলিত)।

وَعَنْ ابنَ عُمَرَ م قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ الله ق بِطَعَامٍ وَقَدْ حَسَّنَه صَاحِبُه ، فَأَدْخَلَ يَدَه فِيْهِ ، فَإِذَا طَعَامٌ رَدِّئُ ، فَقَالَ: بِعْ هَذَا عَلَىحِدَه ، وَهَذَا عَلَىحِدَه ، فَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (رواه احمد)

"ইবন উমার (রা.) বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) কিছু খাবারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, বিক্রেতা তা বেশ সাজিয়ে সুন্দর অবস্থায় রেখে দিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, তিনি ভেতর থেকে বৃষ্টি ভেজা খাবার তুলে আনলেন। দোকানীকে বললেন, এটা আলাদা বিক্রি কর, আর ভালোটা আলাদা বিক্রি করবে। যে আমাদের সাথে তথ্য গোপন করবে, প্রতারণা করবে সে আমাদের মুসলিম সমাজভুক্ত নয়।" (হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ, বায্যার, তাবরানী ও আবু দাউদ)।

এখানে সরকারের সতর্কতা ও দায়িত্ববোধের বিষয়টি স্পষ্টভাবে এসেছে। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمُكْرُ وَالْخِدَاعُ فِىْ النَّار

"যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করবে সে আমাদের নয়। কূট-কৌশল ও প্রতারণাকারী জাহান্নামে যাবে।" (তাবরানী, ইবন হেবান)।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর একটি হাদীস আমাদের লোভী মনকে ভেজালমুক্ত করতে সহায়ক হবে বলে আশা করি। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বায়হাকী। রাসূলুলাহ (সা.) বলেছেন, لاتَشبّوا اللبن للبيع "তোমরা বিক্রির উদ্দেশ্যে দুধের সাথে পানি মেশাবে না"। এরপর তিনি বলেন–

ألا وإن رجلا ممن كان قبلكم جلب خمرا إلى قرية فشابها بالماء فأضعف أضعافا فاشترى قردا فركب البحر حتى إذا لجج فيه ألهم الله القرد صُرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل وفتح الصرة وصاحبها ينظر إليه فأخذ دينارا فرمى به فى البحر ، ودينارًا فى السفينة حتى قسمها نصفين

"জেনে রাখ! তোমাদের পূর্বেকার যমানায় (যখন মদ হারাম ছিল না) এক ব্যক্তি কোনো গ্রামে শরাব বিক্রি করতে গিয়ে তাতে কয়েকগুণ পানি মিশিয়ে বিক্রি করলো। ওই অর্থ দিয়ে সে একটি বানর খরিদ করলো। এরপর সমুদ্র পথে জাহাজে করে পাড়ি দিল। যখন সমুদ্রের গভীরে চলে গেল এ সময় আল্লাহ্ ওই বানরের মনে ঢেলে দিলেন যেন দীনারের ব্যাগটি নিয়ে আসে। বানরটি দীনারের থলিটি নিয়ে মাস্তুলের ওপর চড়ে বসল। সেখানে বসে থলিটি খুলে ফেললো। দীনারের মালিক ওদিকে তাকিয়ে রইল। বানরটি থলে থেকে একটি দীনার বের করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করছে আরেকটি দীনার জাহাজে ফেলছে। এভাবে সে দুভাগ করে দিল।"

[যে বা যারা ঘুষ গ্রহণ করে এবং ঘুষ প্রদান করে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের অভিসম্পাত করেছেন। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)]

এ হাদীসটিতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। অপরকে ঠকানো পয়সা দিয়ে কেউ সুখী হতে পারে না। বরং কোনো না কোনো উছিলায় তা ধ্বংস হয়ে যায় অথবা দুঃখ-দুর্ভোগ ডেকে আনে। রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর আরেকটি হাদীস এ প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ:

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ

"যে ব্যক্তি কোনো ত্রুটিসহ কোনো দ্রব্য বিক্রি করল অথচ ক্রেতাকে তা জানালো না সে অব্যাহতভাবে আল্লাহ্‌র গজবে পড়ে থাকবে এবং ফেরেশ্‌তাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকবে ।" (ইবন মাযাহ)।

আজ আমরা যখন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির নানা অর্থনৈতিক কারণ খুঁজে হয়রান হচ্ছি তখন একবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলে এসব প্রশ্নের জবাব মিলে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

وَلَمْ يَنْقُصُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلاَّ اَخَذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ

"কোন জাতির মধ্যে ওজনে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা দেখা দিলে অবশ্যই তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও সরকারের নিপীড়ন এসে পড়বে।" (ইবন মাযাহ, আত-তারগীব, খ.৩, পৃ.৩৩।)

অপর হাদীসে আছে–"ওজনে ফাঁকি তথা উপাদান সঠিক মাত্রায় না দিলে আল্লাহ্‌ সে সমাজের জীবিকা সঙ্কুচিত করে দেন ।" (আত-তারগীব, খ.৩, পৃ.৩০)।

ভেজালের প্রসঙ্গে নকল ও জালিয়াতির বিষয়টিও উঠে আসে। পরীক্ষায় নকল করে বেশি নম্বর পাওয়ার চেষ্টা এবং নকলের মাধ্যমে পাস করে যারা সার্টিফিকেট লাভ করে এবং পরবর্তীতে এদেরই কেউ কেউ শিক্ষক হয়–তারা নিশ্চয়ই উপযুক্ত শিক্ষক হন না। এইসব অযোগ্য শিক্ষকের ছাত্ররাও কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা লাভে ব্যর্থ হয়। এভাবেই জ্ঞান অর্জন না করেই সার্টিফিকেটের জোরে এবং তার সাথে তদবীর ও ঘুষের সহযোগে যারা চাকুরী বাগিয়ে নেন তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন। এভাবেই যেমন মুরগি তেমন ডিম, আবার যেমন ডিম তেমন মুরগি- এই দুর্বল আবর্তন চলতে থাকে। ফলে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

আবার ধরা যাক, যারা টাকায় ভেজাল দিচ্ছে, জাল টাকা দিয়ে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করছে, আধুনিক মুদ্রণ কৌশল রপ্ত করে জাল টাকা বানিয়ে তা দিয়ে সম্পদের মালিক হচ্ছে–তারা মূলত অন্যের পরিশ্রমকে বিনে পয়সায় নিজের করে নিচ্ছে। অন্যকে ঠকাচ্ছে। এটি মারাত্মক জালিয়াতি। এইসব নোট বাজারে আসার পর মুদ্রাস্ফীতিসহ নানান অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। মুদ্রা জালিয়াতি হচ্ছে ঘরে বসে পরস্ব / সর্বস্ব অপহরণ। এটি চুরি-ডাকাতিকেও হার মানায়। অথচ সমাজে এই জাল টাকা নিয়ে কত সহজ-সরল মানুষ খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে।

দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের সনদ, সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট-ভিসা জালিয়াতি করে। যারা ধরা খাচ্ছে তারা দেশ-বিদেশে খুবই বিপদে পড়ছে। যারা এ কাজটি করে দিয়েছে তারা টাকা নিয়ে সরে পড়েছে। যে উপকারভোগী সে একসময় ধরা পড়ে সামাজিকভাবে হেয়-প্রতিপন্ন হচ্ছে এবং আর্থিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার শিকার হচ্ছে।

এভাবে ভেজাল, নকল, জালিয়াতি ইত্যকার ধোঁকাবাজির মাধ্যমে সমাজের কাঠামো নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। অথচ যারা এ কাজগুলো করছে তাদের নামগুলোর অর্থ কতই না ইসলামী ভাবধারায় ব্যঞ্জনাময়। কেবল

[রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার মুসলমান ভাইয়ের নিকট পরামর্শ চায় তখন সে যেন তাকে সৎ পরামর্শ দেয় (ইবনে মাযাহ)]

নামে মুসলিম হলে তো চলবে না। মুনাফিকদের নামগুলোও মুসলিম নাম ছিল। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"প্রকৃত মুসলিম হচ্ছে সে, যার যবান ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে"।

কিন্তু আফসোস! নামের মুসলমান কোটি কোটি আছে, প্রকৃত ইসলামী চরিত্রে উজ্জীবিত মুসলিম কতজন আছে?

ভেজাল আলেম, ভেজাল পীর, ভেজাল শিক্ষক, ভেজাল বিচারক, ভেজাল দোকানদার, ভেজাল লেখক, ভেজাল শিল্পপতি, ভেজাল সমাজসেবক আর ভেজাল জনদরদীতে ভরে গেছে দেশ। কারণ, ভালো জিনিসেরই নকল হয়। বাজারে চালু ব্রান্ডটিই নকল হয়। ওতেই ভেজাল দেয়া হয়। তেমনি ভালো লোকের মুখোশ পরে তারা মানুষ ঠকাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত হক্কানী আলেম, পীর-মাশায়েখ, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক, দিকনির্দেশনাকারী লেখক, শুভ উদ্যোক্তা শিল্পপতি, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মী এরাই তো জনগণের প্রকৃত বন্ধু ও অভিভাবক।

একটি উন্নত জাতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তার সমাজের সম্পর্কের সূতোগুলো থাকতে হবে অটুট, সমাজদেহ থাকতে হবে সুস্থ। জনগণের আচার-আচরণ হবে অনাবিল ও কল্যাণকামী। মুসলিম হয়েও যদি আমরা ইসলামের মহান আদর্শকে ভুলে যাই অথবা সুন্দর সুন্দর নামের লোকগুলো প্রতিনিয়ত অসুন্দর কাজ করে যাই, তাহলে এটি আমাদের জন্য খুবই লজ্জাজনক হবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে পূতঃপবিত্র চরিত্রের মুসলিম এবং সুনাগরিক হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

ড. আব্দুলাহ্ আল-মা'রূফ
পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা।

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ যখন বান্দা রোগে আক্রান্ত হয় অথবা সফর করে আর নিজের নিয়মিত অযীফা আদায় করিতে না পারে তাহার জন্য তাহাই লেখা হয় (সাওয়াব) যাহা সে সুস্থ অবস্থায় বাড়ীতে করিত। (বুখারী)]

বাংলাদেশে ইসলামের সেবায় আমাদের কর্তব্য

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, বিদেশী অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, দুষ্ট বুদ্ধিজীবীদের ইসলামবিরোধী অবিরাম প্রচারণা, এনজিওদের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা, পরিবার-ব্যবস্থা, শিক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংস করার সর্বগ্রাসী তৎপরতা চালানো, ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আদর্শের বিরুদ্ধে একের পর এক পদক্ষেপ, টিভি, রেডিও ও বিভিন্ন চ্যানেল ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামী আদর্শবিরোধী অবিরাম প্রচারণা, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ও তাদের নেতা-কর্মীদের ওপর বর্বর হামলা, ইসলামী ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট্য নির্মূল করার লক্ষ্যে একের পর এক ষড়যন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের তাঁবেদারদের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করে এদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর উৎকণ্ঠা ও শংকা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আসলে শংকার কোনো কারণ ছিল না যদি এখানে ইসলামের জন্য কাজ করার এখনো যে পরিবেশ রয়েছে, সুযোগ রয়েছে, তা ব্যবহার করা হত, কাজে লাগানো যেত।

হাজার বছর আগে এই জমিনে তো শুধু মূর্তি পূজা হত, নরবলি পর্যন্ত হত–ইসলামের কোনো নাম নিশানা ছিল না- সেই অবস্থায় যারা এদেশের ভাষা জানত না, কথা বুঝত না, যাদের দৈহিক গঠনে, খাদ্য অভ্যাসে এ অঞ্চলের মানুষের সাথে মিল ছিল না এমন কিছু সংখ্যক ভিনদেশী মানুষ এসে যদি তাদের আচার-আচরণ, স্বভাব চরিত্র, সেবা-খেদমত দিয়ে লাখো কোটি মানুষের হৃদয় জয় করতে পারে, জনগণের ধর্মবিশ্বাসে, জীবনবোধে, আচার-আচরণে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে, তবে আজ লাখ লাখ আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ, এত ইসলামী ব্যক্তিত্ব, এত মাদ্রাসা, মসজিদ, সংঘ-সংগঠন থাকতে দিন দিন ইসলামের আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হবে কেন ? ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে ক্রমান্বয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছে কেন ? নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও গলদ আছে, ভুল আছে, ত্রুটি আছে। আজ প্রয়োজন সেই ভুলগুলো খুঁজে বের করা, চিহ্নিত করা, সেগুলো দূর করার উপায় উদ্ভাবন করা এবং সে উপায়কে কাজে লাগানো। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য চাই, সেই লক্ষ্যে পৌঁছার বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচী চাই, সেই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বিরামহীন কর্মতৎপরতা চাই, চাই কঠোর অধ্যবসায়, সর্বোচ্চ ত্যাগ। ঘরে আগুন লেগেছে বলে বাড়ি ছেড়ে পলায়ন নয়, সে আগুন নেভানোর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

আসলে আমাদের অধিকাংশের অনুভূতিই যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। ভীরুতা, কাপুরুষতা যেন অনেকের মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। ব্যক্তিস্বার্থ, আত্মকেন্দ্রিকতায় যেন অনেককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। পলায়নী মনোবৃত্তি যেন অনেককে পেয়ে বসেছে। অলসতা, গাফিলতি যেন গ্রাস করেছে। আদর্শ, চেতনা, ত্যাগ আর কোরবানি যেন অন্তর্হিত হতে চলেছে। আত্মমর্যাদা, জাতীয় চেতনাবোধ যেন অনেকের মন থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে। ময়লা মাছির মত দুর্গন্ধ শুঁকে বেড়ানো, ঝগড়া, ফাসাদ, দ্বন্দ্ব-কোলাহলে মশগুল থাকা যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এগুলো সবই খারাপ লক্ষণ, এসবই ধ্বংসের আলামত।

"শুধু গাফলত শুধু খেয়ালের ভুলে
দরিয়া অথৈ ভ্রান্তি নিয়েছি তুলে
আমাদের ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি
দেখছে সভয়ে অস্ত গিয়েছে তাদের সিতারা শশী।"

মহান আল্লাহ্ এই গাফলত সম্পর্কেই বলেছেন, "তাদের মন আছে বটে, বুঝবার শক্তি নেই। তাদের চোখ আছে বটে, দেখতে পায় না। তাদের কান আছে অথচ শুনতে পায় না। তারা হয়ে গেছে চতুষ্পদ জীবের মত; বরং তার চাইতেও অধম। এরাই চরম ঔদাসীন্যে ডুবে রয়েছে।" (আরাফ ঃ ১৭৯)

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ দুনিয়া মোমেনের জন্য জেলখানা আর কাফেরের জন্য জান্নাত। (মুসলিম)]

দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করে বলেছেন–'ইহসাস ইনায়াত কর হার আসারে মুসিবত কা' হে প্রভু তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি প্রদান কর যেন লক্ষণ দেখেই বুঝতে পারি বিপদের স্বরূপ। পূর্বাভাস দেখেই যেন বুঝতে পারি সর্বনাশা ঝড়ের গতি-প্রকৃতি-ভয়াবহতা। সে অনুভূতি, সে দূরদর্শিতাই আজ প্রয়োজন। আমার অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়ার জন্য, আমাকে আবার গোলামের গোলাম তস্য গোলামে পরিণত করার জন্য, আমার সকল অর্জন, সকল গৌরব, সকল মর্যাদা, সম্মান ধুলায় মিটিয়ে দেয়ার জন্য, আমার ইতিহাস, এতিহ্য, স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য বরবাদ করার জন্য কী ভয়াবহ ষড়যন্ত্র, কী লোমহর্ষক অপতৎপরতা চলছে- প্রয়োজন সে সম্পর্কে সজাগ, সতর্ক হওয়া। প্রয়োজন গাফলতের চাদর, আরামের নিদ্রা, আলস্যের ভূষণ পরিত্যাগ করা, জড়তা, ভীরুতা, স্থবিরতা, নিষ্ক্রিয়তা, উদাসীনতা পরিহার করা; ন্যুব্জপৃষ্ঠ সোজা করে, শিরদাঁড়া টান করে, শির ঊর্ধ্বে তুলে দাঁড়ানো। আজ প্রয়োজন ঈমানী শক্তিতে শক্তিমান হয়ে, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে, আত্মমর্যাদাবোধে উজ্জীবিত হয়ে আবার কর্মক্ষেত্রে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়া। আমি মুসলিম, আমার তকবির আল্লাহু আকবার, আমার কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদূর রাসূলুল্লাহ'। আমি আল্লাহ্‌র সৈনিক হিজবুল্লাহ। আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমার আবির্ভাব। বিশ্ব মানবের দিশারীরূপে, পথপ্রদর্শকরূপে, তাদের কল্যাণের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অসত্য ও অন্যায় উচ্ছেদের জন্য আমাকে মনোনীত করা হয়েছে। আমার নবী সারা দুনিয়ার কুফরির মোকাবেলায়, শিরকের মোকাবেলায়, জুলুম-অত্যাচারের মোকাবেলায়, অজ্ঞানতা, মূর্খতা, কুসংস্কারের মোকাবেলায় একা দাঁড়িয়েছেন; সমগ্র দুনিয়ার শত্রুতা-বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে, অবহেলা করে দৃপ্ত পদক্ষেপে সামনে অগ্রসর হয়েছেন; অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার সংগ্রাম চালিয়েছেন। কোনো ভয় কিংবা প্রলোভন একচুলও তাকে নীতিচ্যুত, আদর্শচ্যুত, লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। আমার নবী বলেছেন, "লা তুশরিক বিল্লাহ ওয়াইন হুররিকতা আও কুতিলতা" শিরক করো না আল্লাহ্‌র সাথে, যদি তোমাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে কিংবা কতল করা হয়। তাহলে আমি মূর্তি নির্মাণের জন্য আসিনি। আমি দেব-দেবীর কাছে মাথা নত করতে আসিনি। আমি মূর্তির অভিশাপ, পৌত্তলিকতার অভিশাপ উচ্ছেদের জন্যই আবির্ভূত হয়েছি। আমার ইতিহাস মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসার ইতিহাস, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার ইতিহাস, ইনসাফ ও ন্যায় কায়েম করার ইতিহাস। এ ইতিহাস ম্লান করার সাধ্য কারোর নেই। 'তৌহিদ কি আমানত সীঁনু মে হ্যাঁয় হামারে/আঁসা নেহী মেটানা নাম ও নেশা 'হামারা'। আমার এ বক্ষে বিদ্যমান তৌহিদের পবিত্র আমানত, দুনিয়ার কারোর পক্ষেই সম্ভব নয় আমার নাম ঠিকানা মুছে ফেলা। 'বাতেল ছে দবনেওয়ালা আয় আসেমা' নেহি হাম/সওবার কর চুকা হ্যায় তু ইয়ে ইমতিহান হামারা। - অসত্য অন্যায়ের কাছে পরাভূত হওয়ার জাতি আমরা নই-হে আকাশ, শত সহস্রবার তুমি এই পরীক্ষা নিয়ে দেখেছ। হ্যাঁ, আমরা সেই জাতি-

"নহি মোর জীব ভোগ বিলাসের
শাহাদাত ছিল কাম্য মোদের
ভিখারি বেশেতে খলিফা যাদের
শাসন করিছে আধা জাহান।"
সুতরাং আর ভয় কিসের ? পরোয়া করি কার ?
"মুখেতে কলেমা হাতে তলোয়ার
বুকে ইসলামী জোশ দুর্বার হৃদয় লইয়া ইশক আল্লার
চল আগে চল বাজে বিষাণ
ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমার নিকট যখন দু'ব্যক্তি কোন বিচার নিয়ে আসে তখন প্রথম জনের পক্ষে রায় দিও না, যে পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যক্তির বক্তব্য না শুনে নাও। এমন করলেই তুমি বুঝে নিতে পারবে, কিভাবে বিচার করতে হবে। (তিরমিযি)]

বাধা যে রে তোর পাক কোরান
বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমাম
শির উঁচু করে মুসলমান" ।

আমি যখন একজন মুসলমান তখন আমার চারপাশে মুসলিম নামধারী ব্যক্তিরা অজ্ঞানতার কারণে কিংবা প্রবৃত্তির তাড়নায়, শয়তানের প্ররোচনায়, পরিবেশের প্রভাবে, কুসংস্কারের বশে অথবা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কারণে বা যে কোন উপলক্ষে শিরক করবে, কুফরি ছড়াবে, পাপাচার-কামাচার, অশ্লীলতা-বেহায়ামীর প্রসার ঘটাতে থাকবে, অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে যাবে, সমাজবিধ্বংসী, রাষ্ট্রদ্রোহী, নৈতিকতা বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকবে আর আমি তা কেবল নীরব দর্শক হিসাবে দেখে যাব, সয়ে যাব, এর বিরুদ্ধে মুখ খুলব না, কথা বলব না, এর প্রতিকারের-প্রতিরোধের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করব না, তৎপরতা চালাব না, সোচ্চার হব না, সক্রিয় হব না–এটা সত্যিকার মুসলমানের কাজ নয়, এটা ইসলামী শিক্ষা নয় ।

মহান আল্লাহ কোরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন ঃ "তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব, তোমরা সত্য ও ন্যায়ের নির্দেশ দান করবে । অন্যায়-অসত্য কাজ নিষেধ করবে, প্রতিহত করবে । (৩ ঃ ১১০)

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকতেই হবে যারা মানুষদের কল্যাণের দিকে ডাকবে, ন্যায় ও সৎ কাজের নির্দেশ দেবে আর পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে, এরাই হচ্ছে সফলকাম । (৩ ঃ ১০৪)

"মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু ও সাথী । তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় । অসৎ কাজে নিষেধ করে । সালাত কায়েম করে । যাকাত দেয় । আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে । আল্লাহ এদেরকেই কৃপা করবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়" । (৯ ঃ ৭১)

"তোমাদের কী হলো যে, তোমরা সংগ্রাম করবে না আল্লাহর পথে সেসব অসহায় নর-নারী শিশুগণের জন্য ? যারা বলে হে তোমাদের প্রতিপালক ! এ জনপদ যার অধিবাসী জালিম, এখান থেকে আমাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাও, তোমার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং তোমার পথ থেকে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী বানিয়ে দাও" । (৪ ঃ৭৫)

একজন মুসলমান নিজে যেমন যাবতীয় অন্যায়, অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বাঁচবে অন্যকেও তেমন বাঁচাবে । মহান আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তুমি নিজে জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাক এবং তোমার আহাল পরিজনকেও বাঁচাও ।

আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন ঃ "তোমরা প্রত্যেকেই একেকজন অভিভাবক, কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেকের কাছে নিজ নিজ অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে-আল্লাহর হুজুরে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে" ।

প্রিয় নবী (সঃ) আরো বলেন ঃ "তোমাদের যে কেউ কোনো অন্যায় ও পাপ কাজ হতে দেখবে সে যেন হাত (শক্তি) দিয়ে তা নির্মূল করে । সে শক্তি না থাকলে মুখ দিয়ে তার বিরোধিতা করবে, তেমন শক্তিও যদি না থাকে তবে যেন মনে মনে ঘৃণা করে আর এটা হচ্ছে দুর্বলতম ঈমান" । (মুসলিম) "অন্যায় ও দুষ্কর্ম হতে দেখার পরও লোকেরা যদি তা প্রতিহত করার চেষ্টা না করে তবে অচিরেই তারা সকলে আল্লাহর আজাব দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে" । (তিরমীযী)

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কখনো বাম হাতে না খায় এবং বাম হাতে পান না করে । কারণ, শয়তান বাম হাতে পানাহার করে । (মুসলিম)]

আল্লাহর হাবীব হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন ঃ

"সেই মহান সত্তার কসম যার হাতের মুঠোয় আমার জীবন, তোমরা অবশ্যই সত্য ও ন্যায়ের আদেশ করবে এবং অসত্য ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে। যদি তা না কর তবে অচিরেই আল্লাহতায়ালা তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর আজাব নাজিল করবেন। এরপর তোমরা তাঁকে ডাকবে কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না"। (তিরমীযী) পবিত্র কুরআনে ইসরাইলী সম্প্রদায়ের একটি দল আল্লাহর গজবে বানর হয়ে যাওয়ার ঘটনার উল্লেখ আছে। তাদের অপরাধ ছিল আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শনিবার দিনে মাছ শিকার করা। তাফসিরের কিতাবে আছে, নিষিদ্ধ দিনে মাছ শিকারের ব্যাপারে ইসরাইলীরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক দল ছিল সরাসরি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ শিকারকারী, আর একদল ছিল এ কাজে বাধাদানকারী, অপর দলটি ছিল মৌনতা অবলম্বনকারী নীরব দর্শক। আল্লাহর গজব যখন নাজিল হল তখন মাছ শিকারী এবং মৌনতা অবলম্বনকারী নীরব দর্শক এ দুই দলই বানরে রূপান্তরিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল, কেবলমাত্র বাধা প্রদানকারী দলটিই আল্লাহর গজব থেকে রেহাই পেল।

তাই কোনো মুসলমানের জন্য অন্যায়, জুলুম, পাপাচার দেখে মৌনতা অবলম্বন করার, নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করার অবকাশ নেই। সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে এই পাপে বাধা দেয়ার জন্য। এর উচ্ছেদ সাধন করে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহর রাসূলকে এই পৃথিবীতে পবিত্র কুরআনসহ, সত্য দ্বীনসহ পাঠানো হয়েছে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য। এ দায়িত্ব তাঁর উম্মতদের কাঁধে অর্পিত। এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া, আত্মনিয়োগ করা সর্বযুগের, সর্বকালের সকল দেশের মুসলমানদের উপর অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ মুসলমানদের এই সংগ্রামী ভূমিকায়ই দেখতে চান। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সে দ্বীনই নির্ধারণ করেছেন যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল নূহকে আর যার প্রত্যাদেশ করেছি আমি তোমাদের এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম আমি ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা কর এবং এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ করো না"। (৪২ঃ১৩)

"হে ঈমানদার লোকেরা! আমি কি তোমাদের সেই ব্যবসায়ের সন্ধান দেবো যা তোমাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে ? তা হচ্ছে এই, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। (এর ফলে) আল্লাহ তোমাদের গুনাখাতা মাফ করে দেবেন এবং এমন বেহেশতে তোমাদের প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে সদা বহমান ঝর্ণাধারা। চিরস্থায়ী বেহেশতের অতি উত্তম বাসগৃহ তোমাদের দান করবেন। এটাই পরম সাফল্য"। (৬১ ঃ ১৩-১৩)

একজন ঈমানদার মুসলমানের জন্য কেবল নিজে অন্যায় না করাই যথেষ্ট নয়, অন্যায় উচ্ছেদ করাও তার দায়িত্ব। অন্যায় করার মত অন্যায় সয়ে যাওয়াও অপরাধ। সে আল্লাহর খলিফা। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা তার দায়িত্ব। সে অন্যায় উচ্ছেদের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। এ কাজ যথাযথভাবে করার জন্য হতে হবে ঐক্যবদ্ধ, চালিয়ে যেতে হবে সম্মিলিত সংগ্রাম। এখানে ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত হওয়ার কারণ যেমন ঈমানে আমলে মজবুত ও নিষ্ঠাবান না হওয়া, যেমন সত্য ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় ও সংগ্রামী না হওয়া–তেমনি শংকিত হওয়ার কারণ ফাসাদ এবং দলাদলিতে মশগুল থাকাও। আল্লাহপাক আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু আদর্শের ধারক ও বাহক হওয়ার দাবিদাররাও পারছেন না ঐক্যবদ্ধ হতে, সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। আল্লাহপাক আমাদের হুশিয়ার

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ দান করলে সম্পদ কমে না। ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ বান্দার ইজ্জত-সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর যে কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'য়ালা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম)]

করে দিয়েছেন, 'তোমরা ঝগড়া-ফাসাদ করো না, বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে, ধ্বংস হয়ে যাবে'। এসব আদেশ-নির্দেশ হুশিয়ারি সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও আমরা সেই ফাসাদেই লিপ্ত, আমরা সেই বিচ্ছিন্নতারই বীজ বুনে চলি।

সত্যিই আজ আমরা ইতিহাসের এমন এক বাঁকে এসে উপনীত হয়েছি যেখানে সঠিক সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেয়ার ওপর নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ। যদি আমরা চাই এই সমাজ মনুষ্য বসবাসের উপযোগী থাকুক, এই হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, পাপাচার থেকে জাতি মুক্তি পাক, যদি আমরা চাই এই জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার, বেইনসাফি, বিভেদ-বৈষম্যের অবসান হয়ে সুখী-সুন্দর দিনের আবির্ভাব ঘটুক, যদি আমরা চাই সকল যড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্র, সকল আগ্রাসী শক্তির অপতৎপরতা স্তব্ধ হয়ে যাক, যদি আমরা চাই আমাদের আগামী প্রজন্মসমূহ এই জমিনে ঈমান-ইসলাম নিয়ে, নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় নিয়ে একটি উন্নত জাতি হিসাবে সগর্বে সগৌরবে চিরকাল বসবাস করুক–তবে সব অপশক্তির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তেই হবে।

যদিও শ্বাপদ তোলে বিষাক্ত ফণা
যদিও এখানে অসহ্য হল হীনতার যন্ত্রণা
তবু বহুদূরে ডাক দিল আজ হেরার শিখর চূড়া
ডেরার কপাট খোলো আজ বন্ধুরা
পাশবিকতার ললাটে তীক্ষ্ণ তীর উদ্যত করো
এই সংগ্রাম জেহাদ বৃহত্তর।

কবি রূহুল আমীন খান
নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ হে আয়েশা ! আল্লাহ তা'য়ালা নম্র এবং মেহেরবান, নম্রতা এবং অনুগ্রহ তিনি পছন্দ করেন। নম্রতার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা যাহা দান করেন কঠোরতার ক্ষেত্রে তাহা দান করেন না। (মুসলিম)]

RIBA AND ITS TYPES

Definition of Riba or Interest:

The word 'Riba' means express, increase or addition, which correctly interpreted according to shariah terminology, implies any excess compensation without due consideration. This definition of Riba is derived from the Holy Quran and is unanimously accepted by the all Islamic Scholars.

There are two types of Riba:

1) **Riba An Nasiyah.**
2) **Riba Al Fadl.**

Riba An Nasiyah is defined as excess, which results from predetermined interest which a lender receives over and above the principle (Ras ul Maal).

Riba Al Fadl is defined as excess compensation without any consideration resulting from a sale of goods.

During the dark ages, only the first form (Riba An Nasiyah) was considered to be Riba. However the Holy Prophet also classified the second form (Riba Al Fadl) as Riba.

The first and primary type is called Riba An Nasiyah or Riba Al Jahiliya.

The second type is called Riba Al Fadl, Riba An Naqd or Riba Al Bai.

Since the first type was specified in the Quranic verses before the sayings of the Holy Prophet, this type was termed as Riba al Quran. However the second type was not understood by the Quranic verses alone but also had to be explained by the Holy Prophet, it is also called Riba al Hadees.

Riba An Nasiyah

This is the real and primary form of Riba. Since the verses of Quran has directly rendered this type of Riba as haram, it is called Riba Al Quran. Similarly since only this type was considered Riba in the dark ages, it has earned the name of Riba Al Jahiliya. Imam Abu Bakr Hassan Razi has outlined a complete and prohibiting legal definition of Riba An Nasiyah in the following words:

"That kind of loan where specified repayment period and an amount in excess of capital is predetermined."

One of the hadith quoted by Ali Ibn Abi Talib (RAA) has defined Riba An Nasiyah in similar words. The Holy Prophet said:

"Every loan that draws interest is Riba."

The famous Sahabi Fazala Bin Obaid has also defined Riba in similar words:

"Every loan that draws profit is one of the forms of Riba"

The famous Arab scholar Abu Ishaq az Zajjaj also defines Riba in the following words:

"Every loan that draws more than its actual amount"

The fact that Riba An Nasiyah is categorically haram has never been disputed in the Muslim community.

Riba Al Fadl

The second classification of Riba is Riba Al Fadl. Since the prohibition of this Riba has been established on Sunnah.

Riba Al Fadl actually means that excess which is taken in exchange of specific homogenous commodities and encountered in their hand-to-hand purchase & sale as explained in the famous hadith:

The Prophet said, "Sell gold in exchange of equivalent gold, sell silver in exchange of equivalent silver, sell dates in exchange of equivalent dates, sell wheat in exchange of equivalent wheat, sell salt in exchange of equivalent salt, sell barley in exchange of equivalent barley, but if a person transacts in excess, it will be usury (Riba). However, sell gold for silver anyway you please on the condition it is hand-to-hand (spot).

These six commodities can only be bought and sold in equal quantities and on spot. An unequal sale or a deferred sale of these commodities will constitute Riba.

Riba related Quranic verses

"That which you give as interest to increase the peoples' wealth increases not with Allah; but that which you give in charity, seeking the goodwill of Allah, multiplies manifold."- (Sura al-Rum, verse 39)

"And for their taking interest even though it was forbidden for them and their wrongful appropriation of other peoples' property. We have prepared for those among them who reject faith a grievous punishment."- (Sura al-Nisa, verse 161)

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দূরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তা'য়ালা তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। (মুসলিম ও তিরমিযী)]

“O believers, take not doubled and redoubled interest, and fear Allah so that you may prosper. Fear the fire which has been prepared for those who reject faith and obey Allah and the Prophet so that you may receive mercy.”- (Sura al-Imran, verse -130-2)

“Those who benefit from interest shall be raised like those who have been driven to madness by the touch of the Devil; this is because they say: “Trade is like interest while Allah has permitted trade and forbidden interest. Hence those who have received the admonition from their Lord and desist, may keep their previous gains, their case being entrusted to Allah; but those who revert shall be the inhabitants of the fire and abide.”- (Sura al-Baqarah, verse -275)

“Allah deprives interest of all blessing but blesses charity; He loves not the ungrateful sinner.”- (Sura al-Baqarah, verse -276)

“Those who believe, perform good deeds, establish prayer and pay the zakat, their reward is with their Lord; neither should they have any fear, nor shall they grieve.”- (Sura al-Baqarah, verse -277)

“O believers, fear Allah and give up what is still due to you from the interest (usury), if you are true believers.”- (Sura al-Baqarah, verse -278)

“If you do not do so, then take notice of war from Allah and His Messenger. But, if you repent, you can have your principal. Neither should you commit injustice nor should you be subjected to it.”- (Sura al-Baqarah, verse -279)

“If the debtor is in difficulty, let him have respite until it is easier, but if you forego out of charity, it is better for you if you realize.”- (Sura al-Baqarah, verse -280)

“And fear the Day when you shall be returned to the Lord and every soul shall be paid in full what it has earned and no one shall be wronged.”- (Sura al-Baqarah, verse -281)

Riba related Hadiths

From Jabir (RAA) -“The Prophet (Saw), may curse the receiver and the payer of interest, the one who records it and the two witnesses to the transaction and said: They are all alike [in guilty]”-. (Muslim, Kitab al-Musaqat, Bab la’ni akili al-riba wa mu’kilihi; also in Tirmizi and Musnad Ahmad).

From Jabir Ibn Abdallah (RAA). “Giving a report on the Prophet’s (Saw) Farewell Pilgrimage said: The Prophet (Saw), addressed the people and said “All of the riba of Jahiliyyah is annulled. The first riba that I annual is our riba, that accruing to ‘Abbas Ibn

Abd al-Muttalib [the Prophet's uncle]; it is being cancelled completely." - (Muslim, Kitab al-Hajj, Bab Hajjati al-Nabi (Saw), may also in Musnad Ahmad).

From Abdallah Ibn Hanzalah (RAA). "The Prophet (Saw) said: "A dirham of riba which a man receives knowingly is worse than committing adultery thirty-six times" - (Mishkat al- Masabih, Kitab al-Buyu, Bab al-riba, on the authority of Ahmad and Daraqutni). Bayhaqi has also reported the above hadith in Shu'ab al-Imam with the addition that "Hell befits him whose flesh has been nourished by the unlawful".

From Abu Hurayrah (RAA). "The Prophet (Saw) said: On the night of Ascension I came upon people whose stomachs were like houses with snakes visible from the outside. I asked Gabriel who they were. He replied that they were people who had received interest." - (Ibn Majah, Kitab al-Tijarat, Bab al-taghlizi fi al-riba; also in Musnad Ahmad).

From Abu Hurayrah (RAA). "The Prophet (Saw) said: Riba has seventy segments, the least serious being equivalent to a man committing adultery with his own mother" - (Ibn Majah).

From Abu Hurayrah (RAA). "The Prophet (Saw) said: There will certainly come a time for mankind when everyone will take riba and if he does not do so, its dust will reach him." - (Abu Dawud, Kitab al-Bayu' Bab fi ijtinabi al-shubuhat; also in Ibn Majah).

From Abu Hurayrah (RAA). "The Prophet (Saw) said: Allah would be justified in not allowing four persons to enter paradise or to taste its blessings: he who drinks habitually, he who takes riba, he who usurps an orphan's property without right, and he who is undutiful to his parents" - (Mustadrak al-Hakim, Kitab al-Buyu).

Dr. Mohammed Haider Ali Miah
Additional Managing Director
EXIM Bank, Dhaka

গুলশান কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে বিভিন্ন জু'মায় প্রদত্ত খুতবার উদ্বৃতাংশঃ

সালামের প্রথা চলবে অনন্তকাল [৩০/১২/২০০৫ তারিখে]

হযরত আদম আলাইহিস্‌সালাম ফেরশতাদেরকে সালাম দিলেন, ফেরেশ্‌তারাও সালামের জবাব দিল। তারপর আল্লাহপাক আদম আলাইহিস্‌সালামকে জিজ্ঞেস করলেন; হে আদম ! ফেরেশ্‌তারা তোমার সালামের জবাবে কি বলেছে। আদম আলাইহিস্‌সালাম বললেন, তারা ওয়া আলাইকুমুসসালাম বলেছেন। আল্লাহপাক বললেন, হে আদম ! তুমি কি বললে আর তারা তোমার জবাবে কি বলল; তা স্মরণ রেখো। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আসবে, অনেক মাসায়ালার পরিবর্তন পরিবর্ধন হবে। জেনে রেখো যতদিন এ পৃথিবীতে মানুষ থাকবে, ততদিন এ হুকুমের কোন পরিবর্তন আসবে না। সুতরাং কোন নবীর যুগেও এর মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। শুধু তাই নয় কবরেও পরিবর্তন হবে না, হাশরেও পরিবর্তন হবেনা, পুলছিরাতেও না। কিয়ামত হয়ে যাবে, নামায রোযা হজ্ব-যাকাত কিছুই থাকবে না, কিন্তু সালামের প্রথা চালু থাকবে। জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করতে থাকবে তখন ফেরশতারা তাদেরকে আস্‌সালামু আলাইকুম বলবে, জান্নাতে প্রবেশ করার পরও সালাম থাকবে জান্নাতীরা যখন আল্লাহকে দেখবে তখান আল্লাহপাক বলবেন, আস্‌সালামু আলাইকুম। যতদিন জান্নাতে থাকবে ততদিন সালাম পাবে। জান্নাতে মানুষ কতদিন থাকবে ? অনন্তকাল, অনির্দিষ্টকাল। হিন্দূরা অবশ্য অন্য কথা বলে। তারা বলে, যারা এ দুনিয়াতে খারাপ কাজ করে মৃত্যুর কিছু দিন পর তারা এ দুনিয়ায় আবার কুকুর হয়ে ফিরে আসে। আর যারা ভাল করে তারা মানুষ হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু ইসলামের আকীদা হলো, যারা কালেমা পড়ে জান্নাতে প্রবেশ করল, তারা চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে থাকবে। আল্লাহপাক আমাদের বুঝার তাওফীক দান করুন।

হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামের সেই সালাম পৃথিবীতে চলছে এবং চলতে থাকবে। কারণ ! সালাম হলো শান্তির বাণী। সহীহ শুদ্ধ সালাম আদান-প্রদান কর, তাহলে তোমাদের মধ্যে শান্তি আসবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন মুসলমান পার্থিব মনোমালিন্যের কারণে তিন দিনের বেশী সালাম বন্ধ রাখতে পারবে না। বন্ধ রাখলে তার কোন ইবাদত কবুল হবেনা, এমন কি হজ্বও কবুল হবেনা। ইসলামের দৃষ্টিতে এমন কোন অপরাধ নেই, যার জন্যে সালাম বন্ধ রাখা যাবে। হাদীসে রয়েছে প্রথম সালামদাতা আল্লাহর প্রিয়।

তিন দিন কথা-বার্তা বন্ধ রাখার পর যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম করবে আল্লাহ বলেন ! সে আমার কাছে বেশী প্রিয়। এখানেও আমাদের মধ্যে সীমালংঘন হয়। দুজনের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণে কথা বন্ধ হলে কথা-বার্তা চালু হওয়ার পর যখন কেউ জিজ্ঞেস করে যে, কি ব্যাপার ! আপনারা দেখি আবার মিলে গেছেন, কথা-বার্তাও যে শুরু করেছেন ? তখন যে ব্যক্তি পরে কথা বলতে শুরু করেছে সে বলে, কি আর করব সে আমার কাছে এসে ঘেঁষে ঘেঁষে সালাম দেয়। এ ধরণের বাহাদূরী করা ঠিক নয়।

[রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন - বল- 'লা হাওলা ওালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্'। অর্থঃ কারো শক্তি নেই (দুঃখ কষ্ট দূর করার ও বিপদ আপদে বাঁচাবার) এবং কারো ক্ষমতা নাই (সুখ সম্পদ প্রদানের) একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া। *এটি হচ্ছে জান্নাতের রত্নভান্ডার থেকে আনিত একটি বাক্য। (বুখারী)]*

মুহাব্বাতের অর্থ [১১/০১/২০০৮ তারিখে]

কেবল মুখে মুখে দাবী করলেই নবীর প্রতি ভালোবাসা গ্রহণযোগ্য হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার অর্থ কি তা তিনি নিজেই বলে গেছেন। হযরত আনাসের বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেনঃ "যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসে সে আমাকে ভালোবাসে আর যে আমাকে ভালোবাসে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে"। এই হাদীসে নবীর প্রতি ভালোবাসার প্রতীক এবং নিদর্শন হিসেবে সুন্নাতকে নির্ধারণ করা হয়েছে, যার সারমর্ম এই যে, যে দাবী করে যে, তার ভেতর নবীর প্রতি ভালোবাসা রয়েছে, সে আমার প্রতি আনুগত্যশীল হবে এবং আমার সুন্নাতের অনুসরণ এবং অনুকরণ করবে। আর যার ভেতর আমার আনুগত্য নেই এবং আমার সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ নেই, তার মধ্যে আমার ভালোবাসা ও মুহাব্বাত নেই। কারণ ভালোবাসা এমন জিনিস যে, যে বস্তুর প্রতি অন্তরে ভালোবাসা থাকে, মানুষ তাকে লাভ করার চেষ্টা করে, অর্থ ব্যয় করে, সমস্ত কৌশল অবলম্বন করে।

হযরত হুযাইফা একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। মুসলিম প্রতিনিধি হিসেবে পারস্যের রাষ্ট্রীয় মেহমান হয়ে তাদের আপ্যায়নে শরীক হন। কিন্তু খাওয়ার সময় গোশতের একটি টুকরা পড়ে গেলে তিনি তা উঠিয়ে পরিস্কার করে খেয়ে ফেলেন। একজন তাঁকে বললো আপনি এরূপ করলেন কেন ?, শাহী দরবারে এরূপ করা অভদ্রতা এবং নীচুতার পরিচায়ক। প্রতি উত্তরে তিনি বলেন ঃ " এই আহম্মকদের খাতিরে আমার হাবীবের সুন্নতকে ছেড়ে দেব ? মোটেই সম্ভব নয়।"

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সুন্নাতের উপর আমলের মাধ্যমে রাসূলের প্রতি ভালোবাসার যথার্থতা প্রমান করেছেন। এরূপ অসংখ্য ঘটনাবলী বিদ্যমান রয়েছে।

আমাদের মাঝে যারা বেদ্বীনদের অনুকরণ করি, তাদের অনুকরণের পেছনেও এই একই কারণ, অর্থাৎ ভালোবাসা এবং মুহাব্বত। ইংরেজদের নিয়মে মাথার চুল রাখা, সুট-কোট পরা, টাই লাগানো ইত্যাদির কারণ কি ? যারা এগুলো ব্যবহার করে তাদের কাছে যদি এগুলো সুন্দর আকর্ষণীয় মনে না হতো, তাহলে কি ব্যবহার করতো ? আজ সারা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে বেদ্বীনদের লেবাস পোশাক, বেদ্বীনদের শিক্ষা সংস্কৃতির অনুসরণ ও অনুকরণের হিড়িক কেন ? এই একই কারণ যে, অন্তরে এগুলোর প্রতি মুহাব্বত এবং ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে আছে। আর যে যাকে ভালোবাসে, হাশরের ময়দানে তার সাথেই তার হাশর হবে এবং তা হওয়াই বাঞ্চনীয়।

আল্লাহপাকের দুটি নসীহত [১৫/০২/২০০৮ তারিখে]

দুইটা আয়াত আমি আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছি। এ দুটি আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে দুটি নসীহত করেছেন। নসীহত এজন্য করেছেন, যাতে মানুষ এর উপর আমল করে। আমল করলে মানুষের ফায়দা হবে। প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যে বিষয়ে তোমাদের জানা নেই, সে বিষয়ে যারা জানে তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নাও। এজন্য যে, তোমাদের দুনিয়ার জীবন হল আমলের জীবন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন লোকের সমন্ধে সুপারিশ করে তার নিকট থেকে যে কোনো প্রকারের উৎকোচ গ্রহণ করে সে যেন নিজের জন্য সুদের দার উন্মুক্ত করে নিল। (আবু দাউদ)

আর আখেরাতের জীবন হল আমলের ফল উপভোগ করার জীবন। তাই যাতে আখেরাতে তোমাদের লাভের জীবন হয়, মুক্তি ও নাজাতের ব্যবস্থা হয়, সে জন্য দুনিয়াতে তোমাদের সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। যে জিনিসটা লাভের, সেটা জ্ঞানের মাধ্যমে সঠিকভাবে জেনে সে অনুযায়ী আমল করলে তবেই লাভ অর্জিত হয়। দুনিয়া তো অস্থায়ী, এখানে আমরা সব কিছু দেখতে পারি, বুঝতে পারি, বিবেচনা করতে পারি। এখানেই যখন উল্টা-পাল্টা কিছু করলে লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হয়ে যায়, আখেরাতের বিষয়গুলো তো আমাদের চোখের সামনে নেই, বরং আখেরাতের পূরা জীবনটাই আমাদের দৃষ্টি সীমার বাইরে, বিবেচনা এবং অভিজ্ঞতার বাইরে। সেক্ষেত্রে তো আরো অধিক ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। আর ভুল হয়ে গেলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে আখেরাতে। তাই বলা হচ্ছে-

"যদি তোমরা না জানো, তাহলে জ্ঞাণীগণকে জিজ্ঞেস করো।"

দ্বীনী মাসালা-মাসায়েলের ব্যাপারে যদি তোমাদের জানা না থাকে, তাহলে যারা জানে তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও। তাহলে জানাও হবে এবং আমল সহীহ-শুদ্ধ হবে। আর সহীহ শুদ্ধ অল্প আমল অশুদ্ধ অধিক আমল অপেক্ষা উত্তম।

দুই নাম্বার আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

"আর তুমি উপদেশ দাও, উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।"

ইসলাম কল্যাণমুখী সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম [১৪/০৩/২০০৮ তারিখে]

ইসলাম ধর্ম র্সবশ্রেষ্ঠ মানবকল্যাণমুখী ধর্ম। এটা শুধু মুখের কথা নয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ইসলামই এমন এক জীবন-ব্যবস্থা ও জীবন-বিধান যাতে মানবতার কল্যাণ, মনুষ্যত্বের মূল্যায়ন, জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্য কোন ধর্ম এমনটি দেখাতে পারবে না। এ জন্য ইসলাম ধর্মে শিক্ষার গুরুত্ব আরো অধিক। চরিত্র গঠনে, সমাজ বিনির্মাণে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়, দুনিয়ার ব্যাপারে ও আখেরাতের ব্যাপারে এক কথায় সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। মুসলিম হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। সুতরাং যেখানেই কর্ম রয়েছে, সেখানেই শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দিবে।

যদি শিক্ষা না থাকে, তাহলে মানুষের আক্বীদা ঠিক থাকবে না, ইবাদত ঠিক থাকবে না, লেনদেন ঠিক থাকবে না। মোটকথা শিক্ষা ব্যতীত দুনিয়া ও আখেরাত কোনটাই ঠিক থাকবে না।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রেরিত নবী মুহাম্মাদূর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রথম না ইবাদতের নির্দেশ দিলেন, না শুকরিয়ার নির্দেশ দিলেন, না নামাযের নির্দেশ দিলেন, না রোযার নির্দেশ দিলেন, না কোন আক্বীদার নির্দেশ দিলেন, বরং সর্বপ্রথম নির্দিশ দিলেন জ্ঞানার্জনের। অর্থাৎ আল্লাহ বললেন, তোমার এবং তোমার উম্মতের জন্য জ্ঞানার্জনকে আমি প্রধান বিষয় হিসেবে ঘোষণা দিলাম। কেননা জ্ঞানের ভিত্তিতে ধর্মের প্রচার-প্রসার লাভ হবে।

"তুমি পড়া শুরু করো তোমার প্রভুর নামে। যিনি তোমার লালন পালনকর্তা।" এখানে আল্লাহর অস্তিত্ব ও আল্লাহ্'র একটি বিশেষ গুণের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি প্রদানে যে সকল বস্তু প্রতিবন্ধক হতে পারে, তন্মধ্যে অন্যতম দুনিয়ার মুহাব্বত। দুনিয়াতে থাকতে গেলে মানুষের পানাহার, ঘর-বাড়ি,

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ কোন বান্দা হারাম পদ্ধতিতে উপার্জিত অর্থ দান খয়রাত করলে তা কবুল হবে না এবং তা নিজ কার্যে ব্যয় করলে বরকত হবে না। আর ঐ ধন তার উত্তরাধীকারীদের জন্যে রেখে গেলে তা তার জন্য দোযখের পুজিঁ হবে। (মিশকাত)]

অর্থ-সম্পদসহ আরো কত কিছুর প্রয়োজন রয়েছে। এ সকল প্রয়োজন না মিটিয়ে উপায় নেই, কিন্তু এগুলো মিটাতে গিয়েই মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় অর্থলিপ্সা, পদের লোভ, ক্ষমতার লোভ। এগুলো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও আখেরাতের চিন্তার পথে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, পদমর্যাদা, শক্তি, অর্থ সম্পদের মূল চাবিকাঠি আমার হাতে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেয়া-নেওয়ার মালিক আমি। সুতরাং কার ভয়ে তুমি আমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করো। বুঝা যায় যে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আকীদার বিষয় হলো আল্লাহর অস্তিত্ব ও আল্লাহর একত্ববাদ। কিন্তু এটাকেও দ্বিতীয় নম্বরে রাখা হয়েছে, আর জ্ঞান চর্চাকে রাখা হয়েছে এক নম্বরে।

শরিয়তের সকল বিধান মানুষের কল্যাণের জন্য [১৫/০৮/২০০৮ তারিখে]

শরীয়তে যত প্রকার হুকুম-আহকাম আছে, যেমন ইবাদতের ব্যাপারে, আকীদার ব্যাপারে, লেনদেনের ব্যাপারে, দুনিয়ার ব্যাপারে, আখেরাতের ব্যাপারে এক কথায় শরীয়তের যত ব্যাপারে হুকুম এসেছে, সবগুলো হুকুমই ব্যক্তি ও সমাজের শান্তির জন্য, নিরাপত্তার জন্য। আমাকে বলা হয়েছে, আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে মানবে না, এটাও আমার দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তার জন্য। আমাকে বলা হয়েছে, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মান, এটাও আমার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য। আমাকে বলা হয়েছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ো, এটাও আমার দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি, নিরাপত্তা ও মঙ্গলের জন্য। এভাবে যাকাত বলেন, ফিতরা বলেন, এক কথায় ইসলামের করণীয় যত হুকুম আছে, তার মধ্যে একটা হুকুমের ব্যাপারেও আপনি একথা বলতে পারবেন না যে, এর মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার কোন গ্যারান্টি নেই। আর যেগুলোর ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারেও একই কথা। এমন একটাও বিষয় নেই, যা আপনাকে শরীয়ত নিষেধ করেছে, অথচ সেটাতে আপনার লাভ রয়েছে। শরীয়তের বর্জনীয় এমন একটা হুকুমও আপনি দেখাতে সক্ষম হবেন না, যা করলে আপনার ক্ষতি হবে না। আজ হোক কাল হোক, দুনিয়াতে হোক আখেরাতের হোক তা আপনার অপকার সাধন করবেই। এতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। সুতরাং বোঝা গেল যে, শরীয়তের প্রতিটা আদেশ ও নিষেধ আমার মঙ্গলের জন্য এসেছে।

মাওলানা মাহ্‌মূদুল হাসান
মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
খতীব, গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ

[আল্লাহর রাসুল (সাঃ) সুদ দাতা, সুদ গ্রহীতা, সুদের লেখক এবং সুদের লেনদেনের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, তারা সকলেই সমান অপরাধী । (মুসলিম)]

গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটির কার্যক্রম

১৯৭৪ সাল থেকে আমাদের প্রথম সভাপতি মরহুম মাগফুর আলহাজ্ব দেওয়ান আব্দুল বাছেত সাহেবের নেতৃত্বে ৩০ জন উদ্যোক্তা সদস্যের সমন্বয়ে মসজিদ প্রতিষ্ঠার সার্বিক কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৭৬ সালে তৎকালীন ডি.আই.টি নির্ধারিত গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহর জন্য নির্ধারিত জায়গাটি বরাদ্দ পাওয়া যায়। অতঃপর একটি চালা টিনের ছাউনি ও বেড়া দিয়ে কাঁচা ঘরে তৎকালীন খতিব মরহুম মাওলানা আব্দুস সালামের প্রথম ইমামতিতে গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের (তখন আজাদ মসজিদ নামে খ্যাত) যাত্রা শুরু হয়। আমাদের সোসাইটির শুরু থেকে অদ্যাবধি যারা গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ সভাপতি ও সেক্রেটারী জেনারেল পদে অধিষ্ট থেকে এই প্রতিষ্ঠানকে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করেছেন, তারা হলেন ঃ সভাপতি পদে সর্বজনাব মরহুম দেওয়ান আবদুল বাসেত, মরহুম বিচারপতি আবদুল জব্বার খান, মরহুম মোঃ শাহজাহান, মরহুম মোশাররফ আলী, মরহুম কে, এম, এম, আব্দুল কাদের, মরহুম এম, মশিহুর রহমান, মরহুম কাজী এ, গোফরান এবং বর্তমানে সৈয়দ আহমাদ এবং সেক্রেটারী জেনারেল পদে সর্বজনাব মরহুম শামসুদ্দিন, মরহুম কে, এম, নুরুদ-দাহার এবং বর্তমানে এম, এ, হান্নান। উনারা সবাই আমাদের সোসাইটির বর্তমান অবস্থায় উপনীত হতে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁরা সকলেই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। যারা পরলোক গমন করেছেন মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের নিকট তাদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করছি এবং যারা বেঁচে আছেন তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করছি যাতে তাঁরা আরো বেশি বেশি মসজিদের তথা দ্বীনের খেদমত করতে পারেন। প্রায় ৪০ বছর তাঁদের সুযোগ্য নেতৃত্বে বর্তমানে মসজিদটি একটি তিনতলা ইমারতে উন্নীত হয়ে একসঙ্গে প্রায় ১৫,০০০ মুসল্লীর নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি আমাদের সোসাইটির সার্বিক উন্নয়ন ও বর্তমান কার্যক্রম সম্বন্ধে আপনাদের নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে অবহিত করার চেষ্টা করছি।

ক) মসজিদের নিচতলায় প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৬টি এ.সি সংযোজন করা হয়েছে। এই এ.সিগুলো চালানোর জন্য আমাদের সোসাইটির সম্মানীত আজীবন সদস্য জনাব ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল হক ৫০০ কে.ভি.এ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জেনারেটর অনুদান দিয়ে সাহায্য করেছেন। মসজিদের নিচতলা ও দো'তলায় টাইলস্ লাগানো হয়েছে। সম্প্রতি মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দিকের দেয়ালে ইটালিয়ান মার্বেল লাগানো হয়েছে। উক্ত মার্বেল লাগানোর কাজে সাকুল্য খরচ অনুদান হিসাবে দিয়েছেন আমাদের সোসাইটির সম্মানীত আজীবন সদস্য বিএনএস গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব এম এন এইচ বুলু।

খ) সম্প্রতি মসজিদের চার কোনায় ৪টি মিনার নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমাদের সম্মানিত সদস্যদের মধ্য থেকে ৩ জন সদস্য ৩টি মিনার নির্মাণ করে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন । তারা হল (১) সামসুল আলামিন রিয়েল এস্টেট, (২) সাউথ ব্রিজ হাউজিং লিঃ এবং (৩) ইউনাইটেড গ্রুপ এবং বাকি ১টি নির্মাণের জন্য সদস্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছে। আশা করি এটিও শীঘ্রই সমাধান হবে। উল্লেখ্য ৫২ ফুট উচ্চতার প্রতিটি মিনার নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় ২০ লাখ টাকা। ইতোমধ্যে সামছুল আলামিন রিয়েল এস্টেট ও সাউথ ব্রিজ অনুদানকারী প্রতিষ্ঠান মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কর্নারে এবং উত্তর-পূর্ব কর্নারে ২টি মিনার নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক। আশা করা যায় আগামী ৫/৬ মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে ইনশা-আল্লাহ।

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ মুনাফিকের পক্ষে ফজর ও ইশা অপেক্ষা কঠিন নামায নেই। যদি তারা জানত এর মধ্যে কি রয়েছে, তাহলে তারা এর জন্যে আসত, যদিও তাদের আসতে হতো হামাগুড়ি দিয়ে। (বুখারী ও মুসলিম)]

গ) মসজিদে একটি আন্তর্জাতিক মানের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এই খাতে এ পর্যন্ত মোট খরচ হয়েছে প্রায় ১৭ (সতের) লাখ টাকা এবং আমাদের সদস্যদের নিকট থেকেই এ অর্থ অনুদান হিসেবে সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যাশা অনুযায়ী মাদ্রাসার সামগ্রিক অগ্রগতি এখনও সম্ভব হয়নি, তবে মাদ্রাসার কার্যক্রম চালানোর জন্য উপ-কমিটি আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ৭/৮ জন ছোট ছোট বালক বালিকা নিয়ে নুরানী পদ্ধতিতে মক্তব শুরু হয়েছে। উক্ত মক্তব বিকাল ৩:৩০ মিনিট থেকে ৫:০০টা পর্যন্ত চালু থাকে।

ঘ) আমাদের হাফিজিয়া মাদ্রাসাটি মসজিদ থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার পর এর শিক্ষার পরিবেশ ও মান অনেক উন্নত হয়েছে। মাদ্রাসায় বর্তমানে ৪০ জন ছাত্র অধ্যয়নরত আছে। আমাদের মাননীয় সদস্য জনাব আলহাজ্ব কাজী যাইনুল আবেদীন, জনাব আলহাজ্ব নূরে-ই-আলম সিদ্দিকী এবং জনাবা বেগম খন্দকার আব্দুল মতিন হাফিজিয়া মাদ্রাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন।

ঙ) সম্প্রতি মসজিদের জন্য ৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ উপযোগী একটি ইলেকট্রিক সাব স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। এই কাজে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৫ লাখ টাকা। বর্তমানে মসজিদের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

চ) কালামে পাকের গুরুত্ব অনুভব করে যারা ত্রিশ পারা কালামে পাক বক্ষে ধারণ করে হাফেজ হয়েছেন তাদের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য এবং হাফেজ হওয়ার জন্য অন্যদেরকে উৎসাহিত করার জন্য আমরা বাৎসরিক হেফজ প্রতিযোগিতার আয়োজন প্রায় সূচনালগ্ন থেকে চালিয়ে আসছি। এ উপলক্ষে গুলশান, বনানী, বারিধারা, বাড্ডা, ক্যান্টনমেন্ট, মহাখালী, তেজগাঁও, রামপুরা, খিলক্ষেত, এয়ারপোর্ট, উত্তরখান, দক্ষিণখান, তুরাগ ও উত্তরা এলাকার মসজিদসমূহের খতমে তারাবীর হাফেজ সাহেবদের সম্মানে ইফতারের আয়োজন করা হয় এবং হেফ্জ প্রতিযোগীদের নগদ অর্থ ও বই পুরস্কার দেয়া হয়। তাছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের হাফিজিয়া মাদ্রাসার উত্তীর্ণ হাফেজদেরকে পাগড়ী পরানো হয়।

ছ) আমাদের সোসাইটির শিক্ষা, সংস্কৃতি, গবেষণা ও জনসংযোগ উপ-কমিটির উদ্যোগে পবিত্র সিরাতুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য প্রতি বছর ইসলামী জ্ঞান ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। গত বছর দু'টি গ্রুপে সর্বমোট ২৪ জনকে নগদ অর্থ ও বই পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

জ) মসজিদের নতুন সাউন্ড সিস্টেম আরো উন্নতির জন্য টোয়া ব্রান্ডের একটি মেশিন ক্রয় করে সংযোজন করা হয়েছে। এখন সাউন্ড আশানুরূপ হয়েছে। সাউন্ড সিস্টেম উন্নয়নে প্রায় ১৮ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে।

ঝ) আমাদের সোসাইটির উদ্যোগে প্রতি বৎসর বেশ কিছু বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয়ে থাকে যথা– রমযান মাসের তাৎপর্য, ঈদ-উল ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, শবে-মেরাজ, মহর্‌রম মাসের তাৎপর্য, পবিত্র শব-ই-কদরের তাৎপর্য ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের খতিব জনাব মাওলানা মাহমুদুল হাসান জু'মার নামাজের বক্তব্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করে যাচ্ছেন। তাব'লিগ জামাতের বিশিষ্ট আলেমগণ তাব'লিগ সম্বন্ধে সারগর্ব বক্তব্য রাখছেন। তাব'লিগ জামাতের দাওয়াতের মেহনতে মসজিদে মুসল্লির সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বেড়ে চলেছে। আমাদের অনেক সম্মানিত সদস্য এ ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং তালিমে অংশগ্রহণ

[রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ গরগর-মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন। (তিরমিযী)]

করে যাচ্ছেন। আমরা আশা করি, এ ব্যাপারে আমাদের সম্মানিত সদস্য এবং মুসল্লিগণ আরও উদ্যোগী হবেন এবং অধিক হারে কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে দাওয়াতের কাজ প্রসারিত করার ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর যাবত বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অস্ট্রেলিয়ান সরকারের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও অর্থ উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োজিত জনাব আবুল এহসান জু'মার নামাজে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিচ্ছেন। শেখ আলাউদ্দীন আল বাকরী এবং সৌদি আরবের পবিত্র মসজিদ-ই-কাবার সম্মানিত প্রাক্তন খতিব ও বর্তমানে মদিনা শরিফের প্রিন্স মসজিদের খতিব জনাব ফয়সাল গাব্বানী আমাদের মসজিদে জু'মার নামাজে খোতবা দিয়ে থাকেন। ইহা দ্বীন সম্বন্ধে মানুষকে সঠিক শিক্ষা দেয়ার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ।

ঞ) দুস্থ মানবতার সেবায় আমাদের ফ্রি মেডিকেল সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের মনে হয়, মসজিদ সংলগ্ন চিকিৎসা কেন্দ্র হিসাবে এটি অনন্য। প্রতিমাসে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান, থেকে ৩০-৩৫ হাজার টাকা মূল্যের এন্টিবায়োটিকসহ প্রায় ৮৫টি আইটেমের ওষুধ ক্রয় করে তা বিনামূল্যে প্রায় ৫০০-৬০০ জন দরিদ্র রোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এতে অত্র এলাকার আশপাশের ও অন্যান্য এলাকার মা ও শিশুসহ বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম আমাদের সোসাইটির সম্মানিত সদস্যগণ ও মসজিদের মুসল্লীদের অনুদানের অর্থ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এদের মধ্যে রয়েছেন মিরপুর সিরামিক ওয়ার্কস, সর্বজনাব রহিম আফরোজ, মীর নজরুল ইসলাম, রইস উদ্দীন, মোঃ তালহা ও নূর ই ইকবাল। তাঁরা সকলে আমাদের ধন্যবাদের যোগ্য।

ট) আল্লাহ্'র দেয়া কিতাব থেকে জ্ঞানের আলো ও হেদায়েত লাভ করার উদ্দেশ্যে আমাদের মসজিদে প্রতি শুক্রবার বাদ মাগরিব তাফসীরে কোরআনের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের বিজ্ঞ আলেমগণ কষ্ট করে তাফসীরে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে সর্বজনাব মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা মাহবুবুর রহমান, মাওলানা আনোয়ারুল হক, মাওলানা নিয়ামত উল্লাহ আল ফরিদী, মাওলানা আনোয়ার হোসেন মোল্লা ও মাওলানা মনসুরুল হক উল্লেখযোগ্য।

ঠ) আমাদের ধর্ম উপ-কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নূরানী পদ্ধতিতে কোরআন শরীফ শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যাতে মুসল্লীগণ অতিসহজে অল্প সময়ে নির্ভূলভাবে কোরআন শরীফ পড়তে পারেন, শিখতে পারেন। বর্তমানে প্রতি বছর ১ মাস মেয়াদের ৪টি কোর্স পরিচালিত হচ্ছে।

ড) স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণের ছেলে-মেয়েদের কালামে পাক পড়ানো এবং অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রায় সূচনালগ্ন থেকে এ শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজও সাফল্যের সাথে এই শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমরা এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে কোর'আন শরীফ শিক্ষা এবং অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছি।

ঢ) বর্তমান সময়ে কর্মসংস্থানের জন্য ইনফরমেশন টেকনোলজি শিক্ষার যথেষ্ট চাহিদার কথা বিবেচনা করে আমরা ২০০৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে ইনফরমেশন টেকনোলজি ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করি। একজন অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে এখন পর্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাচ্ছি। প্রতি তিন মাসের কোর্সে এপর্যন্ত মোট প্রায় ৫০০ জন ছেলে-মেয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের মধ্য থেকে প্রায় ১৩০ জনের ইতিমধ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। বেকার সমস্যা সমাধানে সামান্য হলেও আল্লাহ্'র মেহেরবানীতে আমরা কিছুটা ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছি।

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা আশুরার দিনে রোজা রাখ কিন্তু এতে ইহুদিদের বিরোধিতা কর। এটা এ প্রকারে যে আশুরার সঙ্গে এর পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী দিনেও রোজা রাখ। (মুসনাদে আহমদ)]

ণ) আমাদের মুসল্লীদের সহিহ ও শুদ্ধভাবে সূরা কেরাত ও নামাজের আদব কায়দা জানার জন্য প্রায় দুই বছর যাবত প্রতিদিন বাদ ফজর অনুর্ধ্ব ৩০মিনিট দার্‌ছে কোরআন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিদিন ১০/১২ জন মুসল্লী এতে অংশগ্রহণ করছে। পবিত্র কুরআনের ৩০নং পারা এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূরা অর্থসহ ছহিহ তেলাওয়াতের নিয়ম কানুনসহ এ দারস্ দেয়া হয়। এতে অনেকের ভূল উচ্চারণ শুদ্ধ করে ধরিয়ে দেয়া হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনেক উপকৃত হচ্ছে।

ত) আমরা দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ প্রদানের জন্য বহু দিন যাবত বৃত্তি প্রদান করে আসছি। এই খাতে প্রতি বছর প্রায় ১২০,০০০/- টাকা শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী দরিদ্র ছেলে-মেয়েদেরকে বৃত্তি প্রদান করে উৎসাহিত করা হয়। তাছাড়া মেধাবী গরিব ছাত্র, মুসাফির, ছিন্নমুল নিঃস্ব ও এতিমদের সাহায্যার্থে আমরা একটি তহবিলের আয়োজন করেছি। এ তহবিল সাধারণত সদস্যদের দেয়া যাকাতের টাকা ও বিভিন্ন অনুদানকারীদের দানে গঠিত। এ তহবিল থেকে আমরা উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। যথা ঃ হাফেজিয়া মাদ্রাসার গরিব ছাত্রদের খাওয়া, অসহায় দরিদ্র রোগীদের ওষুধপত্র ক্রয় ও জরুরি চিকিৎসার্থে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা ও অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান, বিপদগ্রস্থ লোকদের রাহা খরচ বাবদ সাহায্য করা, দরিদ্র ও নওমুসলিম কন্যাদায়গ্রস্তদের সাহায্য করা, দরিদ্র ছাত্রদের বই এবং টিউশন ফি বাবদ অর্থ দিয়ে সাহায্য করা।

থ) আধ্যাত্মিক তথা আত্মার উন্নয়ন প্রচেষ্টায় হালকায়ে জিকির আমাদের মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের ইমাম জনাব মাওলানা শামছুল হক কিছু সংখ্যক মুসল্লীকে নিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত এ অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

দ) সূচনা থেকেই আমরা একটি লাইবেরি চালু করি। বর্তমানে আমাদের লাইব্রেরিতে বাংলা ১৪২৫ খানা, ইংরেজি ৩৬০ খানা ও আরবি ২০৫ খানাসহ মোট ১৯৯০ খানা বই আছে। লাইব্রেরিতে বিভিন্ন ধরনের বইপত্র, দৈনিক খবরের কাগজ থাকার কারণে পাঠকের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, আমরা অনেকদিন যাবত বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার সৌজন্য কপি পেয়ে আসছি, যথাঃ দৈনিক নয়া দিগন্ত, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক জনতা, দৈনিক খবর, দৈনিক কালের কণ্ঠ।

ধ) বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, ঝড় ও মঙ্গাকবলিত এলাকার মানুষদের আমরা নগদ অর্থ, খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র ও মালামাল দিয়ে সাহায্য করে থাকি। বিশেষ করে বিগত কয়েক বছর যাবত শীতার্তদের মাঝে আমাদের সম্মানিত আজীবন ও কার্যকরী কমিটির সদস্য জনাব আলহাজ্ব নুরুল ফজল বুলবুলের সৌজন্যে কম্বল ও শীতবস্ত্র বিতরণ করে যাচ্ছেন।

ন) আমাদের মসজিদে প্রত্যেক দিন আছরের নামাজের পর ধারাবাহিকভাবে বোখারী শরীফ ও মেশকাত শরীফ থেকে হাদীস পাঠ করে তার বাংলা তর্জমা করা হয়। এতে মুসল্লীগণ হাদীস সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান লাভে সক্ষম হচ্ছে।

প) আমাদের ফুল ও ফলের বাগান মসজিদের সৌন্দর্য্য এবং গাম্ভীর্যকে যেমন বৃদ্ধি করেছে তেমনি পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকতাকে করেছে পবিত্রময় ও সুখকর। তাই অনেকে এমনকি অনেক বিদেশী দূর-দূরান্ত থেকে এসে এই মসজিদে নামাজ আদায় করতে আনন্দ পান।

ফ) মানুষের ইন্তেকালের পর তার জানাজার গোসল দেয়ার জন্য আলাদাভাবে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। আমাদের কর্মচারীদের মধ্য থেকে কয়েক জনকে পুরুষ ও মহিলাদের লাশ গোসলের জন্য শরিয়া মোতাবেক

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ তুমি দান করতে থাকবে হিসাব করবে না। দান করলে সম্পদ কমে না। যখন কোন বান্দাহ কোন প্রার্থীকে দান করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় তখন প্রার্থীর হাতে দান পৌছানোর পূর্বেই তা আল্লাহর হাতে পৌছে যায়। (তাবরানী)

বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আশপাশের হাসপাতালগুলি ও ফ্লাট বাড়িতে যারা ইন্তেকাল করেন মোতাবেক তাদের জন্য শরিয়াসম্মতভাবে গোসল করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ব) আমাদের সোসাইটির আজীবন সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন অব্যাহত রয়েছে এবং এপর্যন্ত আমাদের সোসাইটির আজীবন সদস্য সংখ্যা ৪৩০। তার মধ্যে বর্তমানে জীবিত আছেন ৩২৫ জন। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে এটা শুভ লক্ষণ। এখনো অনেকে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মসজিদভিত্তিক সমাজ গঠনে এই আগ্রহ বহুলাংশে সফল হবে ইনশা-আল্লাহ্‌।

এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আর্থিক সঙ্গতি না হলে কোন পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আমাদের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এটি আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এটা সত্য যে, সূচনা থেকেই এ যাবৎ আল্লাহ্‌'র মেহেরবানীতে আমাদের কার্যক্রম বন্ধ থাকেনি। মসজিদের মুসল্লীদের পাশাপাশি আমাদের সোসাইটির বর্তমান ৪৭ জন কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে গঠিত ৫টি উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দ তাদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দিয়ে আমাদের কর্মসূচীগুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের অসম্পূর্ণ কাজগুলি ক্রমান্বয়ে সফলভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হব ইন্‌শা-আল্লাহ্‌। উল্লেখ্য, মসজিদ উন্নয়নে আমরা ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করেছি। এগুলো হলো ঃ (১) মসজিদের ২য় তালয় এয়ার কন্ডিশনার (এ.সি) সংযোজন (২) মসজিদের বাউন্ডারি ওয়ালগুলি ইসলামী আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন করে নির্মাণ করা (৩) মসজিদের উত্তর দিকের সিঁড়ি ছাদ পর্যন্ত উন্নীত করা (৪) মসজিদের বারান্দা ও অজুখানায় মার্বেল লাগানো (৫) মসজিদের বর্তমান অফিসের উপরে ২য় তলায় নতুন অফিস নির্মাণ ইত্যাদি। এসমস্ত কাজের জন্য আমাদের আনুমানিক ব্যয় হবে প্রায় ৩ (তিন) কোটি টাকা। মসজিদের উন্নয়নে উক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আশা করি বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হবে ইনশা-আল্লাহ।

পরিশেষে আমরা আল্লাহপাকের দরবারে জানাই লাখো শোকর এই জন্য যে, আমাদেরকে এ মসজিদের বর্তমান অবস্থায় উপনীত হতে এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যক্রম পরিচালনা করার তৌফিক দিয়েছেন। আমরা ধন্যবাদ জানাই ঐ সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে যারা উন্নয়নকল্পে এগিয়ে এসেছেন, ওষুধপত্র দিয়েছেন, কায়িক পরিশ্রম দিয়ে সর্বাত্মক আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। সকলের সমবেত প্রচেষ্টার ফসল আজকের এই গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ্‌ সোসাইটি। আগামীতে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় আরো সফল হবে এর সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি। আল্লাহ পাকের কাছে এই মোনাজাত জানিয়ে এখানে শেষ করছি। আমিন।

গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটির কার্যকরী কমিটির পক্ষে-

এম এ হান্নান
সেক্রেটারী জেনারেল

[রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- যার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণও অহংকার আছে সে বেহেস্তে যাবে না । এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, যদি কোনো লোক ইচ্ছা করে যে, তার পোশাক পরিচ্ছদ ও জুতা সুন্দর হোক । তিনি বললেন ঃ আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন। অহংকার সত্যকে বিনাশ করে এবং মানুষকে হেয় করে। (মুসলিম)]

রোজার জরুরি মাসআলা

মহান আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলাম। ইসলামের পাঁচটি রোকন। রোজা এই পাঁচটির একটি। রোজা তিন প্রকার: (১) ফরজ, (২) ওয়াজেব, (৩) নফল। রমজান শরীফের রোজা ফরজ। রোজা ফার্সি শব্দ। আরবি প্রতিশব্দ সওম, সিয়াম সওমের বহু বচন। সুবহে সাদেক থেকে মাগরেব বা সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার এবং শরীয়ত সিদ্ধ আরও কতক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার নাম রোজা। রোজার উদ্দেশ্য মানব মনে 'ত্বাকওয়া' বা আল্লাহ ভীতি সৃষ্টি তথা মানুষকে পরহেজগার-মুত্তাক্বী বানানো। মানুষ লোক চক্ষুরঅন্তরালে অনেক পাপাচার করতে পারে, কিন্তু আল্লাহ পাকের চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারবে না। কারণ, তিনি সবকিছু দেখেন এবং শোনেন। রোজাদার ব্যক্তি ইচ্ছা করলে মানব চক্ষুর আড়ালে পানাহার এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজ সেরে নিতে পারতো, কিন্তু না, সে এসব করবে না, সেখানে কেউ দেখুক আর নাই-ই দেখুক আল্লাহ তায়ালা দেখছেন। আল্লাহ তায়ালার উপর এই দৃঢ়বিশ্বাস ও ভয়ের নামই ত্বাকওয়া। সুতরাং রোজা যে পরহেজগার বা মুত্তাক্বী বানানোর শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মাহে রমজান শরীফ এবং রমজানের ফরজ রোজার ফজিলত সীমাহীন। এই মাস রহমত, মাগফেরাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস, পবিত্র কোরআন নাযেলের মাস। বদর যুদ্ধও এই মাসে অনুষ্ঠিত হয়, যা ইসলামের প্রথম বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে।

রোজার ফরজসমূহঃ

(১) খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা, (২) সর্ব প্রকার পানীয় দ্রব্য এবংে ধূমপান থেকে বিরত থাকা, (৩) যৌন বাসনা পূর্ণ করা থেকে বিরত থাকা, (৪) রোজার নিয়ত করা। নিয়ত রাতে করাটাই উত্তম।

যে সব কারণে রোজা নষ্ট হয় ঃ

১। দিনের বেলা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে পানাহার করলে, ২। ধূমপান করলে, ৩। দিনের বেলা স্বামী-স্ত্রীর প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটালে, ৪। কেউ যদি স্বেচ্ছায় মুখভরে বমি করে তা হলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে, ৫। দিনের বেলা আগরবাতি বা লোবান জ্বালিয়ে তার ধোঁয়া বহন করলে অথবা বিড়ি সিগারেট হুক্কা ইত্যাদি যে কোন প্রকার ধূমপান করলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।

যে সব কারণে রোজা ভঙ্গ হবে না ঃ

১। রোজা অবস্থায় দিনের বেলা ঘুমের মধ্যে স্বপ্নদোষ হলে বা স্বপ্নে কিছু খেলে রোজা নষ্ট হবে না।
২। রোজা অবস্থায় নাকের শ্লেষা টেনে গিলে ফেললে রোজা নষ্ট হবে না।
৩। অনিচ্ছা সত্ত্বে ধুঁয়া বা ধুলা হলকুমের মধ্যে চলে গেলে রোজা নষ্ট হবে না।
৪। রোজা অবস্থায় ইনজেকশন নিলে রোজা নষ্ট হবে না। তবে গ্লোকুজ ইনজেকশন দ্বারা পেট বা মস্তিষ্কে খাদ্য জাতীয় কিছু পৌঁছে গেলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।

যে সব কারণে রোজা মাকরুহ হয় ঃ

১। থুথু মুখে জমিয়ে গিলে ফেললে;
২। বিনা ওজরে ফরজ গোসল সুবহে সাদেকের পরে করলে;
৩। কোন কিছু মুখে নিয়ে চিবালে;
৪। দাঁতের মাজন, পেস্ট, কয়লা ইত্যাদির দ্বারা দাঁত মাজলে;
৫। কুলি করতে কিংবা নাকে পানি দিতে অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করলে;
৬। রোজা অবস্থায় গীবত, মিথ্যা কথা বলা, ঝগড়া-বিবাদ করলে।

[রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যেন তার অপর ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিজের ক্রয় -বিক্রয়ের প্রস্তাব না করে এবং তার বিয়ের প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব না দেয় । (তিরমিযী)]

Gulshan Central Masjid And Iddgah Society

Member of the Executive Committee for the Year 2011-2012

President

Janab Al-Haj Syed Ahmed

Vice Presedents

Janab M. A. Rashid Talukder

Janab Al-Haj Quazi Zainul Abedin

Janab Al-Haj M. H. Khan

Janab Al- Haj Ali Hossain

Janab Al-Haj Hasan Mahmood Raja

Secretary General

Janab Al-Haj M. A. Hannan

Joint Secretary General

Janab Al-Haj Akhtaruzzaman

Treasurer

Janab Al-Haj Azharul Islam Chunnu

Secretary (Social Welfare & Health)

Janab Dr. S. A. Mahmood

Secretary (Finance)

Janab Al-Haj Md. Azizul Haque Bhuiyan

Secretary (|Religious Affairs)

Janab Dr. Delowar Hossain Dulal

Secretary (Construction)

Janab Eng. Zahurul Islam

Secretary (Education & Public Health)

Janab Al-Haj Md. Afzal Karim

Executive Members

Janab Al-Haj Noor-E-Alam Siddiqui

Janab Al-Haj Abdul Monem

Janab Al-Haj Azizul Islam Beg

Janab Al-Haj Dr. Major (Rtd) M. Mahfuz Hossain

Janab Al-Haj Md. Iqbal Hossain

Janab Al-Haj Sk. Mobarak Hossain Chowdhury Samir

Janab Al-Haj A. K. M. Faizur Rahman

Janab Al-Haj Ahamed Fazlul Rahman

Janab Al-Haj A. K. M. Nurul Fazal Bulbul

Janab Al-Haj Md. Aminul Haque

Janab Al-Haj Mir Lutful Kabir Saadi

Janab Al-Haj Sayed Rezaul Karim

Janab Al-Haj Mahboob R. Bhuiyan

Janab Al-Haj Muflehur Rahman Osmany

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের পরওয়ারদিগার লজ্জাশীল ও দাতা, যখন তার বান্দাহ দুহাত ওঠান তখন উহা খালি ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। (তিরমিযী)

Janab Al-Haj Dr. M. Q. K. Talukder
Janab Al-Haj Dr. Niaz Rahman
Janab Md. Nasirullah
Janab Al-Haj Abdul Jabbar Mehman
Janab Al-Haj Mahfuzur Rahman
Janab Al-Haj Fazlul Hoque
Janab Mir Nazrul Islam
Janab Al-Haj A.B.A. Sirajuddowla
Janab Arafin Shamsul Alamin
Janab Al-Haj Mohammed Omor Faruque (Dipu)
Janab Al-Haj Md. Qumrul Huda
Janab Al-Haj Mohammed Mohsin
Janab Al-Haj Engr. Syed Mosharraf Hossain
Janab Al-Haj Engr. Md. Nurul Haque
Janab Al-Haj Md. Abul Hossain
Janab A. Rouf Chowder
Janab Md. Badrud Doza
Janab Mohd. Abdullah Zaber
Janab Al-Haj Mohammad Rafiqul Islam

Member of the Governing Body of the Islamic Research Society

Chairman

Janab Al-Haj Muflehur Rahman Osmany

Vice Chairman

Janab Al-Haj Hasan Mahmood Raja

General Secretary

Janab Al-Haj A. K. M. Nurul Fazal Bulbul

Member (Finance)

Janab Al-Haj Md. Azizul Haque Bhuiyan

Members

Janab Al-Haj Syed Ahmed
Janab Al-Haj M. A. Hannan
Janab Al-Haj Akhtaruzzaman
Janab Al-Haj Sayed Rezaul Karim
Janab Al-Haj Sk. Md. Mobarak Hossain Chowdhury Samir
Janab Al-Haj Engr. Md. Nurul Haque
Janab Al-Haj Azharul Islam Chunnu
Janab Al-Haj A. K. M. Faizur Rahman

[রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন - বেহেশতে প্রবেশ করিবে না (১) প্রতারক (২) কৃপন এবং (৩) যে ব্যক্তি দান করিয়া খোটা দেয়। (তিরমিযী)]

রিসার্চ প্রকাশনায় লেখা প্রদান প্রসঙ্গে

গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ রিসার্চ প্রকাশনায় কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ধর্ম ও শিষ্টাচার বিষয়ক আর্টিকেল ছাপা হয়। এতে আপনি আপনার সুচিন্তিত মৌলিক ইসলামী বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, কবিতা ও অন্যান্য সময়োপযোগী মানব কল্যাণ সহায়ক লেখা পাঠিয়ে দ্বীনি খেদমতে শরীক হোন। এর সার্বিক উন্নয়নে আপনার সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করার অনুরোধ রইল। প্রকাশনার জন্য একটি সুন্দর ইসলামী নাম পাঠানোরও অনুরোধ রইল।

লেখা জমা দেয়ার শর্তাবলী ঃ

- বাংলা বা ইংরেজি, যে কোন ভাষায় হতে পারে (অনূর্ধ্ব ২০০০ শব্দের মধ্যে);
- বিজয় কি-বোর্ডে টাইপ করা সফ্‌ট কপি হতে হবে (সকলকে MS Word 2003 ভার্সনে বাংলা হলে SutonnyMJ ফন্ট এবং ইংরেজি হলে Arial MJ ফন্ট ব্যবহার করার অনুরোধ রইল);
- লেখার নিচে লেখকের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও এক কপি ছবি দিতে হবে;
- সম্পাদনা পরিষদ যে কোন লেখা পরিবর্তন/ পরিমার্জন করতে পারবে।

এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

সম্পাদক
ফোন ঃ ৮৮২৯২৪৩, ০১৫৫২৪৫৪৬৭২
E-mail: gcmisbd@gmail.com

বিনামূল্যে বিতরণ

প্রাপ্তিস্থান ঃ গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটি
১১১, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২। ফোন ঃ ৮৮২৯২৪৩
এক্সিম ব্যাংক ও সানলাইফ ইন্সুরেন্স-এর সকল শাখায় পাওয়া যাচ্ছে